অপরাজিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেয়ার বুকস্
৫৭/২ ই কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

APSARA URVASI

a Bengali novel by

Jitendra Nath Bandyopadhyay

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৭১ সাল

প্রকাশক
শ্রীসমীরণ চৌধুরী
ফেয়ার বুকস্
৫৭।২ই, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪

চল যাই উর্বশীকে দেখে আসি।

উর্বশী! ইন্দ্রসভার অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী!

মন চলে যায় সহজেই পুরাণ ইতিকথার কালে। বেদ হতে পুরাণ রামায়ণ মহাভারতের পাতার আক্ষরিক বন্ধন হতে মুক্তি পেয়ে মনের আরশিতে প্রতিবিম্বিত হয় মোহিনী মধুরা একটি সত্তা। ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তি বাসনায় কঠোর তপঃনিরত বহু তপস্বীর মনোবিকারের পঞ্চশর সদৃশা অপ্সরার নৃত্যপরায়ণা স্বরূপ একালেরও অনেক শিল্পীর রং তুলির টানাপোড়েনে রেশমী শাড়ীর মত নরম আর মসৃণ একটা ধ্যান সেই কোন্ কৈশোর উত্তরণের কাল হতে আজও জীবনের পড়ন্ত বেলায় ধমনীর রক্ত-সঞ্চলনে জীবন্ত হয়ে আছে। গুহাগাত্রে আর প্রাচীন মন্দির-স্থাপত্যে গ্রানাইট বেলেপাথরের মূর্তি, যা অপ্সরার রূপান্তর মাত্র, তাদের পানে নিষ্পলক চেয়ে থাকলে আজও মনে হয় ঐসব শিলাময়ী এই বুঝি প্রাণবন্ত হয়ে মন্দির স্তম্ভের অবলম্বন ছেড়ে নুপুর নিক্কণে উদ্দাম হয়ে উঠে কিঙ্কিনী ঝংকারে অঙ্গ হিল্লোলে নির্বাক অতীতকে সরব করে তুলবে। অগ্নিতেজতুল্য বিশ্বামিত্র তপঃমন্ত্র বিস্মৃত হয়ে নবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আহ্বান জানাবে, —ও হো। আমার হৃদয়ে লীন হও।

সেই অপ্সরাকে দেখতে পাওয়া; পাথরে খোদিত নয়, রক্তমাংসে গড়া অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীর দর্শন এই বিংশ শতকের অষ্টাদশ দশকে।

দর্শন বই কি। একে ত দেখা বলা যায় না, যদিও প্রস্তাবক এই শব্দটিই ব্যবহার করেছে। ইন্দ্রসভায় যিনি শ্রেষ্ঠা, দেবযোনি, অবশ্যই তিনি দেবীতুল্য। দেবদেবীর বিগ্রহ আমরা দেখি না. দর্শন করি। এইসব বিগ্রহের চতুর্স্বরূপ। মৃৎমূর্তি, দারুমূর্তি, শিলামূর্তি আর ধাতুমূর্তি। ভুলেও বলা যাবে না মাটির বা কাঠের বা পাথরের

তৈবী অথবা সোনা-পিতলের গড়া। তাহলে পাপ হবে, অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাবে।

সাধুসন্ত মহাপুরুষ, যারা অধ্যাত্ম জগতে বিচরণ করেন; তোমার আমার মত পুত্রকলত্র নিয়ে সমাজজীবনের অনুশাসনে সংসারের ঘানিতে বাঁধা বলদের মত চোখে ঠুলি বেঁধে অর্থাৎ নিজ নিজ স্বার্থের আবর্তে ভোজন শয়ন মৈথুনে আবদ্ধ নন; তাঁদের কাছেও আমরা দর্শনে যাই।

এঁদের অনেকের ঠিকানা আমার জানা। হয় কোন আশ্রমে বা মন্দির চত্বরে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিত্তশালী ব্যক্তির বিলাসবহুল অথচ অনাড়ম্বর দ্বিতল বা ত্রিতলের কোন উচ্চ প্রকোষ্ঠ। অবশ্যই আদিকালের মত জনপদের বাইরে কোন বেণুবনে, বট-অশ্বত্থমূলে বা উদ্যানবাটিকার পর্ণকুটিরে নৈব নৈব চ।

কিন্তু উর্বশীর অবস্থান?

পুরাণে সকল সময়ই তার সাক্ষাৎ পেয়েছি ইন্দ্রসভায় অথবা কঠোর তপস্যারত ধ্যানমগ্ন কোন ঋষির আশ্রম আঙ্গিনায়। তাকে মানবীরূপে চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার হিমাদ্রিশৃঙ্গের রাজপুরীর শয়নকক্ষেও দেখেছি। ঋক্‌বেদ অনুসারে সেই সময়কালটা মাত্র চার বছর। সুতরাং এটাকে স্থায়ী ঠিকানা কি করে ধরা যায়। বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ-ধন্যা আম্রপালীর নিজস্ব ভবনের মত উর্বশীর কোন নির্দিষ্ট আলয়ের ঠিকানা কোথাও মেলেনি। তাই মনে হয় অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী সকল সময়েই এক আসর হতে অন্য আসরে ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রাহীন অতল সমুদ্রের অবিরাম উর্মির মতই নৃত্যপরা।

এখানে পুরাণকারের লেখনী স্তব্ধ, তার কল্পনা শক্তিহীন শিবস্বরূপ শবের মতই নিঃসার। তবু বাক্‌দেবীর কৃপাধন্য বাক্য উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের ধ্বনিতরঙ্গ যুগে যুগে যৌবনের মধুমাসে পুরুষের ধমনীতে উদ্বেল হয়ে যে মূর্তি ধারণ করে সেই উর্বশী পূর্ণ

প্রস্ফুটিতা। এই কি তার ঠিকানা? পুঁথিতে উর্বশীর ঠিকানা পাওয়া দায়। কোন বন উপবন বা প্রাসাদ সে কোনদিন কোন পতিতপাবনকে দান করেনি। যদিও এই অনন্ত-যৌবনা দেহদানে অকুণ্ঠিতা, অনিন্দিতা, অবন্ধনা। সেই সূত্রেও তার ঠিকানা পাওয়া আকাশের তারা গণনার মতই অসম্ভব।

উর্বশী আরও দান করেছিল। একটি পুত্রসন্তান দিয়েছিল পৃথিবীপতি পুরূরবাকে। বধূ ও মাতারূপে উর্বশীর এই ভূমিকা অপ্সরা হিসাবে নয়, মানবীরূপে। মিত্রাবরুণের অভিশাপে অপ্সরা উর্বশী মানবীজন্ম গ্রহণ করে নরদেহী পুরূরবার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপন করেছিল কিছুকাল তিনটি শর্তে। সেই কালে তার পুত্রদান। বৈদিক সাহিত্যে এর নাম আয়ুঃ। আয়ুর পুত্র পুরুর বংশধর পৌরব ও কৌরব। এই সুবাদে পৌরব বংশীয় অর্জুন ইন্দ্রলোকে কামপ্রার্থিনী উর্বশীকে জননী বলে উল্লেখ করায় অভিশপ্ত হয়ে অজ্ঞাতবাসকালে একবছর নপুংসক বৃহন্নলা নামে পরিচিত ছিল।

দিনকাল যখন বদলে গিয়ে প্রায় ইতিহাসের নাগালে চলে এলো তখন পুরাণকাররা আরও একধাপ এগিয়ে বিরহ-পাগল পুরূরবার সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটিয়ে কেউ পাঁচটি কেউ বা সাতটি সন্তানের জননী হিসাবে উর্বশীকে চিত্রিত করেছেন। ঐ সব নাম জানাতেও ভুল হয়নি। অতএব একই হোক আর পাঁচ বা সাত হোক উর্বশীর বধূ ও মাতৃস্বরূপকে অস্বীকার করি কি করে।

শর্ত ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেখান হতে এসেছিল সেখানেই ফিরে গিয়েছিল। এই যাওয়ার কোন ঠিকানা উর্বশী পুরূরবাকে দেয় নি। পুরূরবা শুধু জানত উর্বশী স্বর্গবাসিনী। অতএব রামচন্দ্রের সীতা অন্বেষণের মত পুরূরবারও অরণ্যে সরোবরে আশ্রমে বিচরণ।

কোথায় সেই স্বর্গ?

এই উর্বশীকে দেখার, ভুল হল, দর্শনের প্রস্তাব যে দিয়েছিল সেও কোন ঠিকঠিকানা না দিয়ে আমাকে স্রেফ বগলদাবা করে নিল। সঙ্গী হল আরও একজন, তিনি নামী ফটোগ্রাফার। পুষ্পকরথের মত কোন ব্যোমযান নয়, এমন কি বিংশ শতাব্দীর রকেট বা কোন উপগ্রহ নয়, উর্বশী-দর্শনের যাত্রার যান অতি পরিচিত উর্ধ্বাঙ্গ হলুদ নিম্নাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ট্যাক্সি, যার সামনে ইংরাজী চার অক্ষরের রক্ততিলক আঁকা।

ভাড়াগাড়ীর এমন রংবাহারের তাৎপর্য কি? কবে কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সরকার বাহাদুরকে এমনতর কুটিল পরামর্শ দিয়ে নির্দেশ জারী করেছিলেন এই বিষয়টি অবশ্যই গবেষণার বস্তু। এখন উর্বশী-দর্শনে যাচ্ছি, সময় নেই মহাকরণের মহাফেজখানার বিবর্ণ নথির ধুলি ঝাড়বার। তবে এখানে বলে রাখি ভাড়াগাড়ীর এই সাজ নিয়ে আজই আমার প্রথম ভাবনা নয়, অনেকদিনই ভেবেছি। অনেককে প্রশ্ন করেছি। গাড়ীর চালক সর্দারজীকে; বেলতলার আমলাদের, যারা যারা এই সব গাড়ীর চালচলনের তদারকি খবরদারী করেন। মন-পসন্দ সদুত্তর পাই নি। সকলেরই এক কথা,—মালুম নেহি জী, অর্থাৎ জানি না। কিন্তু আমার এ বিষয়ে নিজস্ব একটা চিন্তা আছে। গোস্তাকী মাফ করতে হবে। উর্বশী দর্শনে যেতে যেতে কথাটা বলে রাখি।

কৃষ্ণবর্ণ তমঃগুণের প্রতীক, ভয়ানক রসের অভিব্যক্তি। গ্রহরাজ কৃষ্ণবর্ণ, জাতকের দুঃখদুর্দশার কার্যকারক। যমরাজও কৃষ্ণবর্ণ; তিনি মৃত্যুর দেবতা, নরকের অধিপতি। তার বাহন মহিষেরও কৃষ্ণবরণ অঙ্গ। এই ভাড়াগাড়ী, শ্লথযানের তুলনায় যার গতি ক্রোধী মহিষের মত একগুঁয়ে দুর্বার, এই ভাবনা মাথায় রেখে মহিষরূপী এই যান আরোহীকে যে কোন সময়ে যমরাজের আলয়ে নিয়ে যেতে পারে তারই সাবধান বাণী বহন করছে এই গাড়ীর নিম্নাঙ্গের কৃষ্ণবর্ণ। তাই যদি সত্য হয় তাহলে সেই মুহূর্তে

আরোহীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গ পদ্মপলাশ লোচনের সামনে ভেসে ওঠে হরিৎবর্ণ সর্ষপক্ষেত্র। তারই প্রতিফলন যানের ঊর্ধ্বাঙ্গে। এই দুইএর পরিণতি সেই পতিতোদ্ধারিণী বিগলিত করুণা গঙ্গাতীরে কেওড়াতলা বা নিমতলাঘাটের চিতাসজ্জা, যা কয়লাকাঠের কালো, পীতবর্ণ মৃতদেহকে গ্রাস করে অগ্নির লেলিহান শিখায় রক্তবর্ণ ধারণ করে। চিতার সেই আগুনের ফুল্‌কি যানের কপালের রক্ততিলক।

তাহলে মানতেই হবে ভাড়াগাড়ীর এই রূপবাহারের রূপকার শুধুমাত্র হিন্দুই ছিলেন না, গভীর শাস্ত্রজ্ঞ। সেই মহাপুরুষের পাদুকা লালবাড়ীতে তাঁর সেই ধ্যান-ঘরের যোগাসনে শ্বেতছত্রের ছায়ায় শোভিত হয়ে দর্শনযোগ্য হওয়া উচিত ছিল। প্রয়োজন ছিল একটি মর্মরপ্রস্তর-ফলক দ্বারদেশে; যাতে লেখা থাকবে,-বিংশতাব্দীর যন্ত্র সভ্যতার অভিশাপকে উপলব্ধি করে দ্রুতযানের কুফলতা সম্পর্কে পথিক ও আরোহীর প্রতি একদা যিনি সত্য উপলব্ধির সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেই দিব্যদর্শী এই প্রকোষ্ঠে একদা তুরিয়ানন্দে মগ্ন ছিলেন।

যান-বাহার থাক, গতিপথে আসি। ট্যাক্সি আদৌ ব্যোম-পথগামী নয়, ওপথে যাওয়ার যানও এটি নয়। চলেছে অবশ্য উত্তরমুখী, দক্ষিণগামিনী গঙ্গার বিপরীত স্রোতের অভিমুখে। এইমাত্র কলকাতার যানজট ছাড়িয়ে টালাব্রীজ উত্তরণ করে দমদমের চিঁড়িয়া মোড়ের ভিড় ঠেলে এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে।

প্রস্তাবককে প্রশ্ন করলাম,—এই কি ইন্দ্রলোকের পথ? অথবা গন্ধর্বলোক?

মানে?

প্রথমে বুঝতে না পারায় ভ্রূ জোড়ায় বিস্ময় চিহ্ন। পরক্ষণেই ভ্রূদ্বয় যথাস্থান লাভ করে হাসির ঝিলিকে তরঙ্গায়িত হয়ে বলল,—তা বলতে পারো। যখন উর্বশীর কাছে যাচ্ছি তখন পথটা যদিও বি. টি. রোড, তবু বলতে হয় ইন্দ্রলোকের পথ।

তারপর একটু থেমে জানালো,—কথাটা আমার প্রতিবেদনে ঠিক খাপ খাইয়ে দোব।

পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকা জগতের ঝানু পত্রকারকে চোখ কান মন সব সময় সজাগ রাখতে হয়। ঠিক সময়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারা। নামী-দামীদের একান্ত সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যাপারে এর জুড়ি নেই। লেখনীর কুশলতায় অক্ষর সাজিয়ে পঙক্তি বিন্যাসে বারাঙ্গনাকে অতি অনায়াসে বরাঙ্গনা করে তুলতে পারে পাঠকের চোখে। অথবা কোন বিশিষ্ট-জন; যার সঙ্গে কোন দামী নামী হোটেল বারে সোমরস পান করে বা কোন বিশেষ জনের একান্তকক্ষে বেলেল্লাপনা সাঙ্গ করে পরক্ষণেই ধরিয়ে দিল দারুণ একটা 'স্টোরি'। এই 'স্টোরি' শব্দটি পত্রিকামহলে ইদানীং দারুণ চালু হয়েছে। আমরা পত্রিকায় যা পড়ি তাকে ঘটনা, ভাষণ বা প্রতিষ্ঠিত জনের বিবৃতি বলে ধরে নিই। কিন্তু ওরা মানে সংবাদদাতারা নিজেদের মধ্যে কথা চলাচল কালে বলেন—'স্টোরি'; অর্থাৎ বঙ্গভাষা'য় গল্প, ঋত্বিক ঘটক যাকে অভিধেয় করেছেন গপ্‌পো।

এই গপ্‌পো ছাপা হলেই উনি বিগলিত; শুরু হয় ফোনাফোনি। দিন স্থির করে প্রস্তাব রাখেন পরবর্তী মাইফেলের। বিপক্ষ বিক্ষুব্ধরা গজগজ করে। কুলের কথা শোনানোর আহ্বান জানায়। পত্রকার কৃতার্থ হাসি ছড়ায়। সে জানে তার হাতে তুরুপের তাস। আমরা পাঠকরা, যা ছাপার অক্ষরে দেখি তাই সরলভাবে মেনে নিই। সুযোগ পেলেই আওয়াজ তুলি, যুগ যুগ জিও। যেমন গির্জার প্রার্থনা সভায় কিশোর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় - আমরা যীশুর মেষ।

এত কথা আমার জানার কথা নয়। নিতান্ত পত্রকার আমাকে মেষশাবক জ্ঞানে কৃপা করে অপরের কথা মাঝে মধ্যে অন্তর খুলে বলে।

এই কারণে ওর চাহিদা সকলের কাছে। মাইনে ভালো, সুযোগসুবিধা চাইতে হয় না আপনিই জোটে। গতিবিধি অবাধ,

রাজনীতিবিদদের একান্ত সলাপরামর্শের দরবার হতে মঞ্চ চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীর শয়নকক্ষ পর্যন্ত। ওকে পেলে সবাই ধন্য। সকলেই জানে এর সচিত্র প্রতিবেদনে তাদের চরিত্র বাল্মীকির এত পরিশ্রমে রচিত রামচন্দ্র বা সীতা চরিত্রকেও ম্লান করে দেয়। সুতরাং এহেন দেবদেবী চরিত্র চিত্রণে কুশলীর নিকট একালের উর্বশী ত তুচ্ছ। বরং অর্জুনকে ইন্দ্রসভায় দেখার পর বিহ্বলা উর্বশী যে আপ্যায়ন তাকে জানিয়েছিল তার চেয়ে কোন অংশে হীন নয় উর্বশীর আজকের আহ্বান। কারণ উর্বশী জানে তার শ্রেষ্ঠতার প্রামাণিক চিত্র ঐ লোকটি যেভাবে তুলে ধরবে তার বিনিময়ে আগামী দিনগুলি রজত-কাঞ্চন ছটায় শতগুণে উদ্ভাসিত হবে। আজকের উর্বশী রূঢ় বাস্তবকে জানে ; প্রচার আর বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্য বোঝে, অর্থের কৌলিন্য, খ্যাতি এবং রূপযৌবনের ক্ষণস্থায়িত্ব অনুধাবন করে।

গাড়ী ব্যারাকপুরের স্টেশনমোড়ে বামদিকে ঘুরল। লাটবাগান বামে রেখে আরও এগিয়ে ডানদিকের সেনানিবাস এলাকা পিছনে সরিয়ে দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের শহীদ মঙ্গল সিংএর মর্মরমূর্তি দর্শন করে শ্রীরামপুর ফেরীঘাটের রাস্তায় ঢুকেই আবার ডাইনে ঘুরে রিভার সাইড রোড ধরল। সাবেকী আমলের বিরাট এলাকা জুড়ে এক একটি প্রাসাদ। প্রাসাদের কুক্ষিদেশের ফাঁকে ফাঁকে বহতা গঙ্গার বুকে নোঙর করা নৌকার মাস্তুল উঁকি দেয়।

গাড়ী পথের ডানদিকে চেপে সামান্য এগিয়ে বামে মুখ ঘুরিয়ে নাক ঠেকালো একটা বড় লোহার ফটকে। তারপরই স্বভাবজাত আর্তনাদ, মোষের গর্জনের মত। যানের ইঞ্জিনের গোঙানী এই মুহূর্তে খুবই মৃদু, মৃত্যুপথযাত্রীর নাড়ী টিপ্‌টিপ করার মত তার মৃদুতর অনুভূতি গাড়ীতে বসে অনুভব করা যায়।

হর্নের শব্দটা মনে হল পিনাকপাণির পিনাকের আওয়াজ। হাল আমলেও যেমন দেখাশোনা যায় ছাইমাখা কোন সাধু গৃহস্থের দুয়ারে এসে শিঙায় ফুৎকার দেয়।

হর্ন শুনে আমার পিনাকপাণির কথা মনে হল কেন জানি না। উর্বশীর মত এই দেবতাটিও পুরাণ পুঁথিতে দেখা যায় অনেক অনাচার করেছেন। তবু কেউ সাহস করে এই মহাযোগীর সম্মুখে অনন্ত-যৌবনাকে লাস্যনৃত্যের সুযোগ দেয়নি। হয়ত ভয়ে। মহাযোগীকে পঞ্চশরে দগ্ধ করার অপচেষ্টার ফলে মদন হয়েছিল অতনু ; কায়াহীন। হয়ত উর্বশীকে আসরে নামালে তারও সেই দশা হত, ইন্দ্রসভার চিরআনন্দের উৎস যেত নিঃশেষ হয়ে। যুগযুগান্তের পুরুষের ধমনীতে আগুন জ্বালানোর রূপবহ্নি ঋষির একটি শ্লোকের দধিসিঞ্চনে চিরকালের মত শীতল হয়ে যেত।

মন আবার ডুব দেয় বেদ পুরাণে। একদা পুরূরবা ইন্দ্রসভায় নাচ দেখতে এসে উর্বশীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকায় উর্বশীর তালভঙ্গ হয়। ফলে ইন্দ্রের শাপে, উর্বশীকে মর্তে এসে পুরূরবার স্ত্রী হতে হল অন্যমতে ব্রহ্মার শাপে আর এক মতে মিত্রাবরুণের শাপে উর্বশীকে মানবীরূপে জন্ম নিতে হয়। পুরূরবার খ্যাতি শুনে রাজপ্রাসাদে এসে দেখা করেন এবং রাজাও মুগ্ধ হন। বিয়ে হয় দুজনের তিন শর্তে। এক, দিনে তিনবার রাজা উর্বশীকে আলিঙ্গন করতে পারবেন এবং উর্বশী কামার্তা না হলে সঙ্গম করা হবে না। দুই, সহবাসকাল ব্যতিরেকে উর্বশী যেন রাজাকে কোন সময় উলঙ্গ অবস্থায় না দেখে। তিন, উর্বশীর শয্যাপাশে দুটি মেষশাবক বাঁধা থাকবে ; রাজা তাদের পুত্রবৎ পালন করবেন।

রাজা তাতেই রাজী। ওদিকে কিছুকালের মধ্যে শচীপতি ইন্দ্র শত অপ্সরার নৃত্য বিচ্ছুরিত আলোকেও সব অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মনের মধ্যে একটি শুধু রব,—হা উর্বশী !

বিরহক্লিষ্ট ইন্দ্র দিব্যদৃষ্টিতে দেখছেন উর্বশী পুরূরবাকে পেয়ে স্বর্গের কথা ভুলে আছে ; সাবধানী প্রেমপাগল রাজাও শর্তগুলি ঠিক মত মানছে। অতএব উর্বশীকে ফিরিয়ে আনা দূর অস্ত।

অনেক ফন্দিফিকির করে শেষে গন্ধর্ব বিশ্বাবসুকে তলব

করলেন। বললেন,—অপ্সরারা ত আমার একার নয়। আমি ওদের কখনসখন আমার সভায় নাচগান করতে তলব করি। বাকি সময় ত ওবা তোমাদেরই।

বিশ্বাবসু করজোড়ে ইন্দ্রের কথা মেনে নিলে দেবরাজ পুনরায় বললেন,—তাহলে কে এক পৃথিবীর রাজাকে নিযে উর্বশী মজে আছে আর তোমরা তাই সহ্য করছ?

বিশ্বাবসু নতি স্বীকাব করল,—আপনার শাপেই ত প্রভু এই অবস্থা। আর ধূর্ত পুরূরবা ঠিক ঠিক শর্ত মেনে চলায উর্বশীও স্বেচ্ছায ফিরে আসতে পারছে না।

ইন্দ্র তার কিরীট হেলনে দ্যুতি ছড়িযে শিবনেত্র হযে জ্ঞান দিলেন,—রাজা বুদ্ধিমান, অবশ্যই ধূর্ত। কিন্তু তোমরা; তোমাদেব কৌশল জানা নাই? প্রবঞ্চকতা? ইন্দ্রজাল?

বিশ্বাবসু ইংগিত বুঝল। জানাল,—দেব আপনি সভা ডাকুন। উর্বশীকে আমি নিয়ে আসছি।

বিশ্বাবসু গন্ধর্বলোকে ফিবে হাহা, হুহু, চিত্ররথ প্রমুখ কুশলী গন্ধর্বদের সঙ্গে পরামর্শ করে হিমাদ্রিশৃঙ্গে নিশিথ রাত্রে পুরূরবাব শয়নকক্ষে উপনীত হল। বিশ্বাবসু মেষশাবক ছুটি কুক্ষিগত করেই উধাও। শাবকের কান্নায় উর্বশীব ঘুম ছুটে যায়। ঘুমন্ত রাজাকে তাঁর অপদার্থতাব জন্য কটূক্তি করলে রাজা দিশেহারা অবস্থায় বিবসন হযেই ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটলেন। হাহা, হুহু এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, বিদ্যুৎ চমকের মত দীপশিখা জ্বেলে দিল। ইন্দ্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ। শর্তভঙ্গহেতু উর্বশী পুরূরবার কাতর আকুতি উপেক্ষা করে ইন্দ্রসভায় ফিরে গেল।

বৈদিক সাহিত্য এখানেই প্রসঙ্গ শেষ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে পুরূরবার কান্নায় গলে গিয়ে পুরাণকাররা রাজার সঙ্গে উর্বশীর বছরে একবার করে মিলনের ব্যবস্থা করে দিল। আর এই সূত্র ধরে উর্বশীর পুত্রসংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছে।

বেদ, তাকে অবলম্বন করে বৈদিক সাহিত্য আর পরিশেষে পুরাণ এই তিনের সূক্ত, শ্লোক ও উপাখ্যানের বেড়াজালে উর্বশীর ব্যাপ্তি ও জটিলতায় আমি দিশেহারা, ভীত।

সত্যই আমার ভয় হচ্ছিল। ফটক যখন খুলে গেল, নুড়ি বিছানো পথে মড়মড় শব্দে যান যখন এগিয়ে গিয়ে গাড়ী বারান্দাব নীচে দাঁড়ালো, তখনই আভিজাত্য, বিলাসিতা আর বৈভবের ঠাণ্ডা বাতাসে মধ্যবিত্তের বুকেব ঠুনকো কলিজায় কাঁপুনি ধরেছিল। নিজের অজ্ঞাতে আপন বেশবাসের মাপ করে মেপে নিয়েছিলাম বেমানানের পরিসরটুকু।

সারাটা পথ সঙ্গের ফটোগ্রাফার জানালার বাইরে মুখ রেখে নিঃশব্দে ধূমপান করে সময় কাটিয়েছে। গেট খোলার অপেক্ষায় গাড়ী যখন দম নিচ্ছিল তখনই মুখ খুলল,—ক'টা এক্সপোজাব দরকার হবে?

যতগুলো খুশী।

আমার সঙ্গে একটামাত্র বাভতি রোল আছে। এত অল্প সময়ের নোটিশ—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে দলের মুল গায়েন গাওনা গাইল,- আরে দিল্লী হতে রমেনদা যখন খবর পাঠালো তখন রাত বারোটা। সেই অত রাতেই ফোনে যোগাযোগ করলাম। এদের কি কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জানলাম উনি গত ক'দিন এখানে অজ্ঞাতবাসে। সেই রাতদুপুরেই ফোন করে বললাম প্রথম সাক্ষাৎকার আমার। ফলে—

কথা শেষ হওয়ার আগেই যান গাড়ীবারান্দায় গতিহীন। আপ্যায়নকারী নোকরের হাতও গাড়ীর দরজার হাতলে।

পুরাণে উর্বশীর আলয়ের বিবরণ নাই, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর

উর্বশীর বর্তমান আস্তানার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বার বার কল্পনার উর্মি-জালে জড়িয়ে যাই।

এসে ত বসেছি হাল আমলের দামী কার্পেট বিছানো ঘরে শৌখিন আসবাবের মধ্যে নরম সোফায়। বিরাট হলঘর। প্রবেশ দ্বারের উল্টো দিকে বন্ধ কাঁচের একপাল্লা দরজার ওধারে খোলা বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে দৃষ্টিতে পড়ে একফালি সবুজের আঁচড় যার সীমানা ঘিরে এলামটি ঘষা প্রাচীর। তার মাথার উপর গঙ্গার ঢেউ খেলানো জলের রূপালী ঝিলিক।

কথায় বলে,—থাকতে থাকতে বিলাত যায়।

বাল্যকালে মা প্রায়ই কথাটা বলত। উত্তরটা জেনেছিলাম তারই কাছে—মন। মন বড় অস্থির, নির্দিষ্ট কোন গণ্ডীতে আটকে রাখা যায় না। যারা এই মনকে সংযত করে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন তাঁরা মহাপুরুষ। আর এই মহাপুরুষকে যে বশ বা বশীভূত করে তারই নাম উর্বশী। এ আমার কথা নয়, অভিধানে আছে। কিন্তু উর্বশী শব্দের এই কি একমাত্র অর্থ?

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা উর্বশীর কি একমাত্র কাজ নৃত্যে সঙ্গীতে দেবতাদের মনোরঞ্জন করা আর ইন্দ্রের নির্দেশে, যেহেতু উর্বশীর উপর তার অগাধ আস্থা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, প্রয়োজন দেখা দিলে অর্থাৎ কেউ ইন্দ্রত্ব-লাভের চেষ্টা করলে সেই তপস্বীর ব্রহ্মচর্য নষ্ট করা!

রামায়ণে আদিকবির ছন্দে লক্ষ্মণজায়া উর্মিলা কাব্যে উপেক্ষিতা। কবিগুরুর দূরদৃষ্টিতে আদিকবির এই অবিচার ধরা দিয়েছে। তিনি উর্বশীর কথাও ভেবেছেন। প্রশ্ন রেখেছেন কাব্যের প্রথম ছত্রে, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্বশী'।

উঃ। কি ভীষণ উপেক্ষা একটি সত্তার। যে উর্বশী বৈদিক সাহিত্য হতে আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ কবির মনে পর্যন্ত আলোড়ন

তুলেছে সেই উর্বশী, অনিন্দ্যসুন্দরী উর্বশী, ষোড়শকলানিপুণা উর্বশী, সর্বকালের মানুষের কাছে ছিন্নমূল বারবধূ হয়েই রইল।

কোন যুগে, কোন মন্বন্তরে গৌতম বুদ্ধের মত কোনও একজন এই তাপিনী, ব্রহ্মচর্য-অপহারিণীকে এতটুকু সান্ত্বনা বাক্য শোনাল না।

সত্যই মন চলে যায় বিলাতে।

কথাটা মায়ের মুখে শুনেছিলাম, অর্থভেদ জেনেছিলাম সেই উনিশ শত বিয়াল্লিশ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারা বিশ্ব উত্তাল আর আমরা সাধারণ বাঙালীরা ইংরেজের প্রতি ভীষণরকম অনুগত, তখন বিলাত' শব্দটি এক দ্বাদশবর্ষীয় বঙ্গসন্তানের নিকট স্বপ্নরাজ্য, স্বর্গপুরী।

উর্বশীকে জানতে মন যখন ডুব দিতে চায় বৈদিকমন্ত্রে, পুরাণ ইতিকথায় আর সাহিত্যে তখন মায়ের কথা মনে পড়ে। ফলে 'বিলাত' শব্দটি আপনা হতেই কলমের মুখে আঁচড় কাটে।

পুরাণ ত বলছে উর্বশী গর্ভধারণ করেছিল, হোক না মানবীরূপে, কিন্তু তার মূল সত্তা ও নাম উভয়ই উর্বশী হিসাবে উদ্‌গীত। বিবাগী-সুরে বলতে পারা যায়—মা হওয়া কি মুখের কথা, প্রসব করলেই হয় না মাতা। এই অজুহাত দেখিয়েই অপ্সরা উর্বশীর মাতৃত্ব হরণ করা যায় অবশ্য। কিন্তু উর্বশীর গর্ভধারণ হেতুই মহাভারতীয় যুগে আমরা পৌরব বংশের উত্থান দেখেছি, কুরুক্ষেত্র সেই বংশের শৌর্য-বীর্য পরাক্রমের স্বাক্ষর বহন করছে। তবু কবিগুরুর উর্বশী—নহ মাতা, নহ বধূ।

উর্বশী অবশ্যই অযোনীসম্ভবা। কিন্তু তার ত একটা জন্মবৃত্তান্ত আছে। এক কেন, একাধিক।

জন্মান্তরবাদের পথ ধরে আজ হতে কয়েক হাজার বছর পিছনে ফিরে নদীমাতৃক ভূখণ্ডে সরস্বতী নদীতীরে কোন গহনবনের উপান্তে আশ্রম আঙ্গিনায় হোমকুণ্ডের অগ্নিকে সম্মুখে রেখে পূর্বগগনে প্রাতঃ-সূর্যের উদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্তে উষাহরণ কালে স্বর্ণাভ রবিরশ্মির ছটায়

দিনের আহ্বানে বেদমন্ত্রধ্বনির অনুরণনে প্রথম সাক্ষাৎ পাই পরোক্ষে বন্দিতা হয়েছে উর্বশী।

বেদ-সংহিতা আর ব্রাহ্মণ্যে উল্লেখ আছে নারায়ণের উরুভেদ করে উর্বশীর জন্ম। এবার যেতে হবে বদরিকাশ্রমে। একদা সেখানে নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষির হাজার বছরের কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তোষ প্রকাশ করলে ইন্দ্রের টনক নড়ে। এদের তপস্যা ভঙ্গের জন্য সব ছল চাতুরী ব্যর্থ হলে ইন্দ্র মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, সুকেশিনী, মনোরমা, মহেশ্বরী, পুষ্পগন্ধা, প্রমদ্বরা, ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা, সোমা, বিদ্যুৎমালা, অম্বুজাক্ষী, কাঞ্চনমালা প্রমুখ যত অপ্সরা ছিল সবাইকে সেই আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। এদের কলকাকলী, নূপুর নিক্বণে নারায়ণ চোখ খুলে রূপের ছটায় মুহূর্তমাত্র বিচলিত হলেন। পরক্ষণেই ইন্দ্রের জারিজুরি বুঝে নিজের উরুতে চপেটাঘাত করে সকল অপ্সরার চেয়ে সুন্দরী এক অপ্সরার সৃষ্টি করেন। উরু হতে জন্ম বিধায় নাম হয় উর্বশী। ঋষির ক্ষমতায় ভীত হয়ে অপ্সরারা ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ওদিকে ইন্দ্র লজ্জায় অধোবদন। নারায়ণ এদের প্রতিশ্রুতি দেন অষ্টবিংশতি দ্বাপরে কৃষ্ণ হয়ে জন্ম নিয়ে এদের সকলকে বিয়ে করবেন।

বড়ই সুন্দর কথা, অদ্ভুত ঘটনা। তবু কয়েক শতাব্দীর সংস্কারের পথ ধরে এগিয়ে এসে মূল তাৎপর্য ও অর্থ হারিয়ে পুরাণকারের সকল আখ্যানকে দৈবিক আখ্যা দিয়ে নির্বিচারে মেনে নেওয়া হয়েছে ঋষি দেবতাদের পক্ষে এসব সম্ভব।

যেমন, একদা পার্বতী নিজের গাত্রমল দিয়ে একটি পুতুল গড়লেন। যতটুকু মালমশলা ছিল তা দিয়ে মুণ্ড তৈরী সম্ভব না হওয়ায় শিবের নিকট বায়না ধরলেন পুতুলটিকে সম্পূর্ণ করে প্রাণদান করতে। নন্দি সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এমন কোন পাপীর সাক্ষাৎ পেল না যার মুণ্ডুপাত করা যায়। শেষ পর্যন্ত এক দিক্‌হস্তীর কপাল

পুতুল। তার অপরাধ উত্তরমুখে শয়ন। সেই হস্তীর মুণ্ড সংগ্রহ করে পুতুলে সংযোজিত করার পর শিব তার প্রাণদান করেন। নামকরণ হল গজমুখ, গজানন ইত্যাদি। আমরা সরল মনে বিনা বিচারে এই ঘটনা মেনে নিয়ে আজও সকল পূজাকৃত্যে গণেশকে প্রথম সারিতে প্রথম স্থানে বসিয়ে রেখেছি।

অতএব ঋষি নারায়ণের উরুভেদ করে উর্বশীর জন্ম হবে এ আর বিচিত্র কি। তবে কেন উর্বশীকে বলা হল—নহ কন্যা। তাকে ত আমরা সহজেই নারায়ণ-কন্যা হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারতাম।

অথচ ভগীরথের শঙ্খনাদের মোহন সুরজালে বিমুগ্ধা গঙ্গা শিবের জটাজাল ছিন্নভিন্ন করে নেমে এলো ধরাধামে, যৌবনের উচ্ছলতায়? ভাসিয়ে দিল জহ্নুমুনির আশ্রম। বেরসিক ঋষি যৌবনকে জানলো না, নির্বিচারে গঙ্গাকে উদরস্থ করল। কিন্তু প্রেমের বড় জ্বালা। ভগীরথ অসাধ্য সাধন করল। মুনি কন্যা-জ্ঞানে গঙ্গাকে মুক্তি দিল জানু ভঙ্গ করে। তখন নাম হল জাহ্নবী। এই গঙ্গা অন্য এক কাহিনীতে শান্তনুর সঙ্গে যখন জড়িয়ে পড়েছিল সেই সময় একবার শ্বশুরের, কুরুবংশের প্রতীপের উরুতে বসেছিল সেই হেতু গঙ্গার আর এক নাম উর্বশী। গঙ্গা পূজা পেল সকলের, আজও পাচ্ছে। তার ধ্যানে নানা নাম, উহ্য শুধু উর্বশী।

হায় উর্বশী! তোমার রূপলাবণ্যে ডুব দিয়ে বার্ধক্যে ন্যুব্জ কোন পুরাণকার, কোন কবি, কি সেকালে কি একালে তোমাকে প্রেয়সী ছাড়া আর কোন স্বরূপেই ভাবতে পারল না, পারবেও না।

মন বলে ওসব গালগল্প। কিন্তু আমি ভাবি গল্পের ত একটা বীজ থাকে, যাকে অবলম্বন করে কল্পনা ডালপাতা ছড়ায়, রূপ নেয় মহীরুহর।

মনের মুখে দুষ্টু হাসি। ইংগিতে জানায় অতীতের অন্ধকার হাতড়াও। মিলিলে মিলিতে পারে সত্যের সন্ধান।

ঐ যে ঋষি জ্ঞানালোকে আজও যাঁর দৃষ্টি প্রখর, যিনি ইতিহাসের কষ্টিপাথরে মানুষের সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লিপিবদ্ধ করছেন, তাঁর রচিত একালের মহাকাব্যের সূত্র ধরে পিছনে বহু বহু পিছনে ফিরে গেলে পৌঁছে যাবে এই ভারত ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গিরিবন আচ্ছাদিত সিন্ধু সরস্বতীর উৎসমুখের সীমানার কাছাকাছি।

কতকাল আগে?

ঋক্‌বেদের রচনাকাল যদি ধরা হয় খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দ অর্থাৎ এখন হতে প্রায় সাত হাজার বছর আগে, তাহলে আরও কয়েক হাজার বছর যোগ দিয়ে সেইকালে পৌঁছালে আমাদের পূর্বপুরুষকে পাবো বন্য হিংস্র স্বরূপে। আত্মরক্ষার তাগিদে হস্তীযুথের মত এরাও গোষ্ঠীবদ্ধ। হস্তীযুথে দাঁতাল মদ্দার প্রাধান্য। মৌচাকে মক্ষীরাণী। আদিম মানবগোষ্ঠীর নেতৃত্বও ছিল তেমনি নারীর হাতে। আজকের নারীর মত তারা 'অবলা' হিসাবে গণ্যা ছিল না। পুরুষের সঙ্গে সমতালে শিকার করত, বিশাল তরুশাখে রাত্রিবাস করত বর্ষার মাসগুলো পর্বতকন্দরে গুহায় আশ্রয় নিত। দলছুট হয়ে পড়লে অসহায়ভাবে হতাশ শঙ্কিত মনে শুধু চোখের জলে আঁচল ভিজাতো না। ভুল হল, তখনও আদিম মানুষ বস্ত্রের উদ্ভাবন করেনি। নারী পুরুষ ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন, নিরাভরণ। লজ্জা নামক বোধের তখনো জন্ম হয়নি। বাঁচার তাগিদে পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কার করেছে, গহন বনের দাবানলের প্রকৃতির কাছে সদ্য শিক্ষা নিয়েছে আগুন জ্বালতে। সেই সুদূরতম অতীতে এক অপরাহ্ণের শেষ লগ্ন। তবু আদিমবনের আকাশছোঁয়া বিটপীর শাখাপ্রশাখাপল্লবে বনভূমি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাত্রির মায়ায় পাখীরা নিঃশব্দ, নিশাচর জন্তুর হুঙ্কারে ভয়ংকর।

কিছুক্ষণ আগে একটি মানব-যূথ বন্য বরাহ শিকার করে এনে ঐ অন্ধকারের সীমান্তে আশ্রয় নিয়েছে। স্থানটি বৃক্ষহীন, কিন্তু

শুষ্ক ও তৃণাচ্ছাদিত। পাশেই ছোট বড় উপলখণ্ড উপ্‌চে খরস্রোতা সরস্বতী দক্ষিণগামিনী। নদীর গায়ে পিঠ এলিয়ে ছোট একটি টিলা। সেখানে উত্তান শায়িতা দলনেত্রী। সাবলীল ভঙ্গীতে উর্দ্ধমুখী, বাম হাতের কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত অংশটুকু ত্রিকোণ সৃষ্টি করে মাথার দিকে নত, চম্পককলি পুরুষ্ট মধ্যমা অঙ্গুলি অবিন্যস্ত পিঙ্গল কেদাম ছুঁয়ে আছে। ডান হাত সম্মুখে প্রসারিত, যার শেষ সীমায় একটি প্রস্তর-কুঠার। ডান পা প্রসারিত, বাম পা উরুসন্ধি হতে গোড়ালি পর্য্যন্ত ঈষৎ ভঙ্গ ; যে ভাঙ্গিমাটি ছোট টিলার প্রতীক যেন। এই মুহূর্তে নেত্রীর দেহ ভঙ্গিমায় কান্তি নয়, আলস্য নয়, খজুতাও নয় ; কেমন একটা নিস্প্রাণ শ্বেতমর্মর মূর্তির পেলবতা। ব্যতিক্রম শুধু নীলাক্ষির দৃষ্টি যা উর্ধাকাশের তারামণ্ডলে নিবদ্ধ থাকলেও ঈর্ষার আগুনে তাপিত। উজ্জ্বল রক্তিম গৌরবর্ণা, গুরু নিতম্বীনি, সুস্তনী, ক্ষীণ-কটিমধ্যমা, বিপুলজঙ্ঘা, রম্ভোরুধারিণী এই নারী এতই নিশ্চলভাবে শায়িতা যেন মনে হয় একালের কোন ভাস্করের গড়া বামপদের প্রথম প্রক্ষেপণে প্রয়াসী স্বরূপা মূর্তিটি যথাস্থানে স্থাপনের পূর্বে শয়ানে রয়েছে। একটু দূর হতে দেখলে মনে হয় ঐ শায়িতা নারীর উত্তোলিত বামপদের জানু ভেদ করে যেন সরস্বতীর জলধারা মুক্তির আনন্দে গড়িয়ে চলেছে।

অবশ্যই এখন অলস মুহূর্ত। উন্মুক্ত আকাশের নীচে পরিচ্ছন্ন ভূখণ্ডে দলের অন্য সকলে তখন আগুন জ্বালতে ব্যস্ত। নারীপুরুষ ছোটবড় মিলিয়ে পনের বিশ জন। দলে কোন বৃদ্ধবৃদ্ধা নাই। আদিম মানুষের গোষ্ঠীতে দৈহিক সামর্থ্যহীনের কোন স্থান নাই ; স্থান নাই আহতের। একমাত্র শিশু, জীবজগতের প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শুধু আশ্রিত। সেই শিশুর কৈশোর যৌবনের দিনগুলোর কোন ভাবনা ছিল না জন্মদাত্রীর। আদিম জন্মদাত্রীর প্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়মেই লালিত শিশু হয়ত কোনদিন হারিয়ে যেত অথবা সাবালক হত অথবা অন্য কোন দলে ভীড়ে পড়ত।

নেত্রী এখনও নির্বিকার, কারণ সে জানে তার রূপযৌবন আর দৈহিক ক্ষমতা দিয়ে সে এদের বশীভূত করে রেখেছে। সুতরাং বরাহ মাংস ঝল্‌সানো হলে ভোজনপর্বে তারও ডাক পড়বে, অথবা একখণ্ড কেউ ছুঁড়ে দেবে তার পানে। তবু তার চোখে ঈর্ষার আগুন, আগামী দিনের সংঘাতের আশংকা। সে নড়ল না, শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে বামদিকে মুখ ফেরালো। তার রক্তাভ গণ্ডদেশ বামবাহুর করতলে আশ্রিত। চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ। সে দেখতে পেল ইতিমধ্যে লতার বাঁধনে মৃত বরাহটিকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে তার নীচে শুকনো ডালপালা জড়ো করা হয়েছে। কেউ পাথর ঠুকে, কেউ বা অরণিকাঠের ঘর্ষণে আগুন তৈরীর চেষ্টা করছে। বয়স যাদের কম একটু, তাদের দু'একজন পাথরের হাতিয়ার দিয়ে কাঁচা মাংস ছাড়িয়ে মুখে পুরে চুষছে।

দৃষ্টি একটু ঘুরে গেল। সেখানে আজকের শিকারে বিজয়িনীকে ঘিরে উল্লাস। সাহস দেখিয়েছে বটে মেয়েটা। বরাহটা যখন আচমকা পাশের ঝোপ থেকে ছুটে এসে দলের একজনকে ধারালো দাঁতের গুঁতোয় ধরাশায়ী করেছে, ঠিক তখনই মেয়েটা এক লাফে বরাহটির পিঠে চেপে এক হাতে গলা জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে পাথরের কুঠারের আঘাতে হিংস্র পশুটার মাথা থেঁতলে দিয়েছিল মৃত মানুষটির রক্তের সঙ্গে বরাহর রক্ত মিশে গিয়েছিল, মৃতের দেহের উপর পশুটা নিথর হয়ে পড়ে গেল। নেত্রী দূর হতে দেখেছে চোখের পলকে ঘটে যাওয়া ঐ ঘটনাটা। মুহূর্তে ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠেছিল; মুহূর্তমাত্র। তারপরই ঈর্ষাপীড়িত চোখের আগুন ছড়িয়ে হাঁক দিয়েছিল।

গোটা দলটা জয়ের আনন্দে বিচিত্র উল্লাসধ্বনিতে বনভূমি সচকিত করে জলের সন্ধানে আর রাত্রির আশ্রয়ের আশায় এই খোলা জায়গায় হাজির হয়েছে নিহত বরাহটি কাঁধে ঝুলিয়ে। আজকের রাতের আহার নিশ্চিত।

পথে সে লক্ষ্য করেছে বরাহর নখরে স্বল্পআহতা বিজয়িনীর দেহের ক্ষতস্থানের রক্ত তারই অনুগত পুরুষরা জিহ্বালেহনে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এ কি নিছক সহানুভূতি না আনুগত্যের প্রথম প্রকাশ ?

ঠিক তখনই জড়ো করা শুকনো ডালপালায় আগুন জ্বলে উঠল। আগুন তখন নেত্রীর দু'চোখেও, যার দহনে হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত লয়ে নাচছে। নেত্রী মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবার দৃষ্টি আকাশে। এখনও সর্বাঙ্গ নিষ্পন্দ, কম্পন শুধু স্তনবৃন্তে।

নির্মল আকাশ যেন নীলাম্বরী শাড়ীর জমিনে তারার চুমকি বসানো। কিন্তু ওটা ?

নেত্রীর চোখের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হল। আকাশের এক প্রান্ত হতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পদতলের নদীধারার মতই বিশাল ঘন তারকাপুঞ্জ। আকাশের বহতা নদী। এর আগেও সে আকাশের বুকে ওটা লক্ষ্য করেছে। দেখেছে বিভিন্ন ঋতুতে তার বিভিন্ন অবস্থান। কখনও বা অদৃশ্য হয়ে যায়; কখনও ভঙ্গি বদলায়। সেই নদীর পশ্চিমপ্রান্ত অবলম্বন করে আছে তাদেরই মত কোন পুরুষশিকারী, অথবা প্রসারিত চতুষ্পদ এক বরাহ বা মহিষ।

নেত্রী অনুভব করল সব কিছুই বদলে যায়। এই যে কয়েক মুহূর্ত আগে যে মানুষটি বরাহের হিংস্র আঘাতে নিহত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে যার মূল্য তাদের কাছে ফুরিয়ে গেল এবং যার শবদেহটি হয়ত এরই মধ্যে বন্যজন্তুর গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সেই মানুষটিই গত-রাত্রে তাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতায় আসবমুগ্ধা করে রেখেছিল। নিছক এক ঘটনামাত্র; যা তাদের জীবনযাত্রায় কোন ছায়া ফেলে না।

ইতিমধ্যে আহারপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিনের মত আজ কেউ নেত্রীকে আহ্বান জানালো না। ঝল্‌সানো বরাহকে ঘিরে বসেছে ওরা সকলে। পাথরের হাতিয়ার দিয়ে মাংস কেটে কেটে মুখে পুরছে। সকলের আনন্দ উজ্জ্বল সপ্রশংস দৃষ্টি আজকের

বিজয়িনীর পানে। নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কায় ক্রুর আক্রোশে নেত্রী নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। একটু যেন দুলে উঠল তার সর্বাঙ্গ। ঠিক তখনই বিজয়িনী চোখ ফেরালো নেত্রীর দিকে। হাতের একখণ্ড ঝল্‌সানো মাংস ছুঁড়ে দিল ওর পানে।

চকিতে বিদ্যুত ঝলকের মত নেত্রীর এতক্ষণের নিঃসার দেহটা খাপখোলা তলোয়ারের মত উঠে দাঁড়াল। বাম হাতে ছুঁড়ে দেওয়া মাংস টুক্‌রোটা লুফে নিয়েই ডান হাতের পাথরের কুঠারটা বিজয়িনীকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল। নিপুণ শিকারীর অস্ত্রকে তড়িৎগতিতে সরে গিয়ে বিজয়িনী ব্যর্থ করে দিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট কুঠার নিকটের বৃক্ষকাণ্ডে বিদ্ধ হল।

নিরস্ত্র নেত্রী : বাম হাতে তখনও অনুকম্পার দান মাংসখণ্ডটা। সে দাঁড়িয়ে আছে ঋজুভঙ্গিতে ; পুনঃ আক্রমণ অথবা আক্রমণ প্রতিরোধের কারণে। একটু দূরের অগ্নিকুণ্ডের উজ্জ্বল শিখায় নগ্নার গাত্রবর্ণ সেই মুহূর্তে তপ্তকাঞ্চন সদৃশ। সে দেখল বিজয়িনীর চোখের আগুন ধেয়ে আসছে তার দিকে। পিছনে দলের অন্য সকলে, যারা আজকের শিকারের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ছিল তার হুকুমের আজ্ঞাবহ। তাদের বিচিত্র ভাষার ঝংকারে বনভূমি উচ্চকিত ; ঘুমভাঙ্গা পাখীদের শঙ্কিত কূজন, বন্যজন্তুর অকারণ আত্মরক্ষার প্রয়াসে ছুটোছুটি, বিটপীর শাখা-প্রশাখার কম্পন। নেত্রী দেখল, সকলের লক্ষ্য সে, অস্ত্র ছিল যাদের হাতে তাদের হাত ধৃত-অস্ত্র নিক্ষেপণে প্রস্তুত। বুঝতে অসুবিধা হল না, কি ঘটতে চলেছে। সে নিজেও ত একদিন তার পূর্বসূরীকে হত্যা করে নেতৃত্ব দখল করেছিল। চকিতে উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকাল। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডকে দ্বিধাবিভক্ত করে মধ্য গগনে বিরাজমান। অনুভব করল তার নেতৃত্বের অবলুপ্তি। বরাহ শিকারের দৃশ্যটি মনের আরশীতে দৃশ্যমান হল। ঠিক তখনই মাংসখণ্ডটি দাঁতে কামড়ে ধরে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিল সরস্বতীর জলে।

ওরা তখন নদীর কূলে। দু'চারজন ঝাঁপিয়েও পড়েছে জলে। এলোপাথাড়ি শিলা বর্ষণে যে কোন মুহূর্তে তার জীবনহানি ঘটতে পারে। সে জলস্রোতের অনুকূলে ভেসে চলল, কখনও বাহুতাড়নে দ্রুতগতিতে, কখনও বা ডুব দিয়ে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাত এড়িয়ে। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে। নেতৃত্ব চলে গেল, দলছুট মত্ত হস্তিনীর মত বাঁচার তাগিদে সে নিরুদ্দেশযাত্রীনী। দু'পাটি দাঁতের শক্ত বাঁধনে তখনও রয়েছে সেই ঝল্‌সানো মাংসখণ্ড যার জলে ভেজা আস্বাদটুকু সে সহজাত প্রবৃত্তিতে চুষছে। অজানার উদ্দেশ্যে সে ভেসে চলেছে, ঠিক যেন একটি উদ্‌বিড়ালি মুখে ধরা তার শিকার রূপালী মাছ নিয়ে জল কেটে কেটে ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চা দিয়ে গিয়েছে, সঙ্গে প্লেট ভর্তি বিস্কুট, কাজুবাদাম, চানাচুর। কাঁচের পাল্লাটা এখন খোলা। আমার চোখের সামনে গঙ্গা, ব্যারাকপুরের গঙ্গা। বোধহয় আমরা পৌঁছানোর একটু আগে জোয়ার এসেছে। তাই জলের স্তর উঁচু। ধীর গতিতে একটা মাল বোঝাই নৌকা এগুচ্ছে গর্ভিনী নারীর মত। আমার চোখের সামনে যে দরজা সেই দ্বারপথে তিনি প্রবেশ করলেন। বহু আকাঙ্ক্ষিত উর্বশী। গঙ্গার পটভূমিকায় দরজার ফ্রেমে আঁটা এক মূর্তি। পরনে পাড়হীন আকাশী রং-এর রেশমী শাড়ী যার মাঝ বরাবর লম্বালম্বি খুব মিহি উজ্জ্বল শ্বেত বুটিদার নক্‌সা থাকায় এক নজরে মনে হয় যেন বাতাসে উড়ন্ত আঁচলপ্রান্ত হতে পাদদেশ পর্যন্ত সাদা নুড়ি বিছানো পাহাড়ী পথ এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে সমতলে। তার ডান কোলে গিনিপিগের মাপের একটি সারমেয় যার নাম বিশারদগণের ভাষায় লাসাএপসো বা পিকিনিজ। বাম পাশে পদ-প্রান্তে আরেকটি সাদা স্প্যানিয়েল, আকারে একটু বড়। বাইরের আলোর প্রতিফলনে ঐ পটভূমিকায় সেই মুহূর্তে মনে হল সত্যই

উর্বশী তার প্রিয় মেষশাবক দুটিকে নিয়ে নদীতীরে পুরূরবার সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষমানা।

আমরা তিনজনে দর্শনমাত্রই কূজন করে উঠলাম অর্থাৎ স্বাগত জানিয়ে তার উর্বশী পুরস্কার লাভের জন্য অভিনন্দিত করলাম। ফটোগ্রাফার তড়িৎগতিতে একাক্ষি হয়ে ক্যামেরার বোতাম টিপেছে। নির্ভুল কাজ, নিশ্চিন্তে বলা যায় একালের উর্বশী সেলুলয়েডের ফিতায় খোদিত হয়ে রইল।

বুকের খাঁজে যুক্তকর ন্যস্ত করে অধরোষ্ঠের ভঙ্গিতে বিগলিত করুণা ছড়িয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। দক্ষিণ করতলে মুদ্রা তুলে নিঃশব্দে পানীয় গ্রহণের আবেদন রাখলেন। পেয়ালা মুখে ওঠানোর সময় ঘরের আলোয় তাকে দেখলাম, চিনলাম। শহর গ্রামগঞ্জের চিত্রগৃহের রূপালী পর্দায় বহু চিত্রে বহু রূপিণী যিনি বহু জনের কামনার নায়িকা পদ্মিনী তিনিই এ বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, 'উর্বশী' উপাধিতে সম্মানিতা। রক্তমাংসের সেই মানসী এই মুহূর্তে আমার নয়ন সম্মুখে।

ডগমগ পত্রকার আলাপন শুরু করল,—আমরা খুব খুশী বাচ্চুদি, আপনি সময় দেওয়ায়।

উর্বশী শুধু হাসলেন, হয়ত এই রীতি, একেবারে মাপা হাসি। এমনটি না হলে পুরূরবার অত কাঁদুনি নির্বিকারচিত্তে উপেক্ষা করতে পারত না।

আর ধন্য এই পত্রকার; যিনি এইমাত্র উর্বশীকে তার রূপালী পর্দার জগতের পোষাকী নামের আভরণ খুলে দিয়ে একেবারে কোন্ এক বাল্যকালে মা বাবা দাদু দিদা অথবা দিদির দেওয়া আদুরে নামের সঙ্গে 'দি' জুড়ে দিয়ে ঘরোয়া পরিবেশের আমেজ আনতে প্রয়াসী, সেই পত্রকার চুলে কলপ দিয়ে ময়ূরপুচ্ছ কাক সাজলেও জীবনের আটচল্লিশটি বসন্ত পেরিয়ে এসেছে। যতই কালাতিকাল ধরে চিরযৌবনা থাকুক না উর্বশী, রক্তমাংসে গড়া

আমাদের সামনে বসা এই উর্বশী নিশ্চয়ই ঐ পত্রকারের অধিক বয়সী নয়। তবে বয়স কত পরিমাপ না করাই বুধজন পন্থা। পণ্ডিতরা বলেন, যৌবনোদ্‌গমের পর হতে মুখের বলিরেখা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন করা ধৃষ্টতা, অসভ্যতা।

ইদানীংকালে বঙ্গভাষার প্রসার প্রয়াসে ইংরাজী শব্দ মিস বা মিসেস ত্যাগ করে ছোটবড় সকলকে দিদি বা বৌদি বলার একটা ধুয়ো উঠেছে। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা যেমন ছাত্রী অভিভাবক এবং সাধারণজন সকলেরই বড়দিদিমণি। অতএব পত্রকারের দোষ ধরছি না। সুযোগ পেলে আমিও দিদি সম্বোধন করে কৃতার্থ হব।

আমি এখন উর্বশীকে নয়, পদ্মিনীকে দেখছিলাম। পদ্মিনীই বা বলি কি ভাবে, কারণ সে ত এই মুহূর্তে কাহিনীচিত্রের নির্ধারিত চরিত্রের বেশভূষা ও প্রসাধনের বাইরে সাধারণ একটি নারী, যে নায়িকা পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার আগে নিছক 'বাচ্চু' নামে পরিচিতা ছিল। অতএব আমি বাচ্চুকেই দেখছিলাম। শ্যামাঙ্গিনী মেদহীন দোহারা চেহারার একটি মেয়ে। মেয়ে নয়, কারণ যে বয়স পর্যন্ত নারীদের মেয়ে বলা যায় সেই স্তর অবশ্যই সে অনেকদিন অতিক্রম করে এসেছে; সুতরাং মহিলা বলাই সঙ্গত।

হারিয়ে যাওয়া বাচ্চুর পদ্মিনী স্বরূপতা হতে উর্বশীতে উত্তরণের পটভূমিকায় মনের দ্বিতীয় সত্তার ধ্যানে আমি বিমূঢ়। তার রাশ কিছুতেই টানতে পারছি না। সে ভাবছে অন্যকথা, তার গতি পিছন পানে। আমি নাচার।

কাহিনী চিত্রের চাহিদা অনুসারে প্রসাধনের প্রলেপের হেরফের ঘটানোর মতই পুরাণকারেরা কি নৈসর্গিক কোন বস্তুর ধ্যানকে কখনও দেবসান্নিধ্যে; কখনও বা রূপান্তর ঘটিয়ে মানবীস্বরূপে পুরুরবার ঘরণী হিসাবে কল্প-কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন?

অথবা, যুগযুগান্তের পুরুষমনের কামনা-বাসনা লালসার কোন প্রতীকি সৃজন করে চতুরাননের মত নানাভাবে নানারূপে অনন্ত-যৌবনাকে চিত্রায়িত করেছেন? আর আমরা আ'জও তাকে সযত্নে লালন করে চলেছি মূঢ় বিশ্বাস নিয়ে নিভৃতে নিঃশব্দে আসঙ্গলিপ্সার আরকে জারিয়ে। আহা কি অপরূপ স্বপ্ন। কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে অন্তরাত্মা তীব্র বুভুক্ষায় উষ্ণ নিঃশ্বাসের আবেগে দোদুল্যমান, তখন মুদিত আঁখির দৃষ্টিপথে উর্বশী নাচে, কখনো সালঙ্কারা কখনো বা নিরাভরণা। সুরাসারে মত্ত দেবগণ তার নৃত্যে ছন্দে মুদ্রায় বাক্‌হীন গতিহীন মহাস্থবির। অথবা, মিত্রাবরুণ আধ্যাত্মবাদের কূটতর্কে মগ্ন। অকস্মাৎ নভোদেশে রিনিঝিনি। বিঘ্ন। এ কি দৃশ্য!

পবনের সর্বশক্তির আকর্ষণে উত্তম-বসনা তখন প্রায় বিবসনা। মিত্রাবরুণ দর্শন মাত্রই বিচলিত; চকিতে অনঙ্গ-উপাসক। ব্যাকুল আহ্বান। সবিনয় প্রত্যাখ্যান। উর্ধরেতার রেতঃপাত। অভিশাপ।

এই স্বপ্ন, সোনালী স্বপ্নে খাদ রয়েছে কিনা বাস্তব-যুক্তির ধারালো কূটচালিতে কেউ তা হারাতে চায় না। হোক না অলীক, হোক কল্পকথা, কবির কল্পনা, তবু বলি উর্বশীকে কেউ দূ'রে সরিয়ে দিতে চায় না। এই স্বপ্ন, এই আকর্ষণ প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্ত হতেই যে বিদ্যমান।

পরমপিতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। নিঃসঙ্গতা দাহ করছে হৃদয়কে। অহর্নিশি চিন্তা; এক নয়, দুই। দুর্দম বাসনার ভিতর হতে জন্ম নিল দ্বিতীয় সত্তা। শিবনেত্র উন্মোচন করে দ্বিতীয়ার দর্শনে ইন্দ্রিয় বিক্ষুব্ধ। প্রশ্ন করলেন,—তোমার এই বৈপরীত্য কেন?

দ্বিতীয়ার অধরোষ্ঠে দ্বিতীয়ার চাঁদের বিকাশ,—ত্রিলোকে পুরুষ ত একজনই। সে তুমি।

তাহলে তুমি কে?

আমি নারী, তোমার নিঃসঙ্গতার পরিপূর্ণতা।

উত্তম। তবে তাই হোক।

এবার শুরু হল দ্বৈত পরিব্রজা। আবার ক্লান্তি, আবার চিন্তা—দুই নয়; বহু। ঠিক তখনই বিশ্বজননী তুরীয়ানন্দে প্রস্ফুটিত এক বৃক্ষের ফলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে জানতে চাইলেন,—ওটা কি ফল?

পরমপিতা বললেন,—ওর নাম জ্ঞান। এই ফল ভক্ষণ করলে সহস্রার জ্ঞানকোষ প্রজ্জলিত হয়ে সত্যের সন্ধান দেয়।

আমি সত্যকে জানতে চাই, তোমাকেও।

বলে একটি ফল আহরণ করে পরমপিতাকে আলিঙ্গনে বেঁধে একসাথে রস পান করলেন। হানিল বিজলী চমক, মেঘ গর্জনে গুরুগুরু কম্পন। অভূতপূর্ব অনুভূতি উভয়কে চঞ্চল করে তুলল। উভয়ে উভয়কে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পরিচিত হলে পরিতৃপ্ত পরমপিতা আহ্বান জানালেন,—এস এবার আমরা প্রজা সৃষ্টি করি।

দ্বিতীয়ার চোখে স্পন্দন, স্মিত হাসিতে মদিরতা, হৃদয়ে ব্যাকুলতা, চিন্তায় কুটিলতা। জ্ঞানের বিকাশ।

অস্থির পরমপিতা ঘোষণা করলেন,—দুই নয়; আবার হতে হবে এক; অর্ধনারীশ্বর। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, এবার তুমি আমাকে প্রসব করো।

দ্বিতীয়া প্রশ্ন রাখল,—কার কি ভূমিকা?

আমি ধাতা, তুমি ধাত্রী। আমি উৎস, তুমি আধার।

বুঝি বা সংশয় দ্বিতীয়ার,—অর্থাৎ আমি নিমিত্ত মাত্র?

দ্বিধাগ্রস্ত পরমপিতা। মুহূর্ত চিন্তনে দৃঢ় প্রত্যয়,—না, তুমি আদ্যাশক্তি। তুমিই প্রেরণা। আমার মন-মন্থনে তোমার আবির্ভাব ঘটলেও তুমিই মুলাধার। তোমার অমৃত আসবের বিমুগ্ধতায় আমি উদ্বেলচিত্তে প্রাণ হতে প্রাণের সৃষ্টি করে হতে চাই প্রজাপতি। তুমি এই প্রজাপতির জন্মদাত্রী।

সেই শুরু, প্রাণজগতের জৈবিক নিয়মে প্রাণ হতে প্রাণের

সঞ্চার। স্থূল হতে সূক্ষ্ম বোধের বিকাশ। মানুষের স্বতন্ত্র জীবে রূপান্তর। এ যেন সকল পার্থিব ঐশ্বর্য পেয়েও মনন দিয়ে গড়া মানুষের শান্তি হারানো। অস্থিরতার ভোগান্তি।

প্রজা সৃষ্টি করে বিশেষতঃ মননশক্তি সম্পন্ন মানুষ নামক জীবের পানে তাকিয়ে বিশ্বজননী চিন্তিত হলেন। সেই চিরন্তন প্রশ্ন—কে শ্রেষ্ঠ।

সৃষ্টির আদিতে যে প্রশ্ন; আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন তুললেন তিনি,—আমি কি শুধুই প্রজননের আধার হয়ে থাকব ?

পরিতুষ্ট পরমপিতা তুরীয় অবস্থায় জবাব দিলেন,—না। সৃষ্টির কারণে যৌবনে তুমি হবে লাস্যময়ী, অনিন্দিতা, অবন্ধনা। আমি প্রেম সৃষ্টি করব। তার বসতি হবে তোমার বিলোল কটাক্ষে, ভ্রূ-ভঙ্গিমায়, দেহবল্লরীতে। অগ্নি নতুন রূপে তোমাতে স্পন্দিত হবে, আকর্ষণ করবে পতঙ্গের মত পরমপিতাকেও। তুমি মূলাধার নিবাসী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি।

এই আশীর্বচনই কি অযোনিসম্ভবা উর্বশী।

উর্বশী! অপ্সরা উর্বশী!

উর্বশীকে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীতে স্বনামে প্রথম পাওয়া যায় বৈদিকগ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে। উপনিষদ, সংহিতা এবং পুরাণের বিভিন্ন উল্লেখ ও কাহিনীর সূত্র ধরে উর্বশী শব্দের উচ্চারণমাত্রই মনশ্চক্ষে একটি রূপ ফুটে ওঠে যার ভিত্তিতেই হয়ত বৈয়াকরণিকগণ শব্দটিকে ভেঙ্গেচুরে অর্থভেদ করেছেন উরু (মহাপুরুষ)কে যে বশীভূত করে। পুরাণ কাহিনী এই ভাবেই উর্বশীকে উপস্থাপিত করেছে। দেখা যায় ইন্দ্র তার নিজের স্বার্থে অথবা উর্বশী নিজেই তার যৌবন মাদকতায় বারাঙ্গনা হিসাবে চিত্রায়িতা।

অথচ একালের একজন স্বনামধন্য পণ্ডিতের মতে উর্বশী নামটির আসল অর্থ হল যাঁর বাসনা অত্যন্ত ব্যাপক। সুতরাং একটা খুবই

স্বাভাবিক যে একদা সুদূর অতীতকালে কামনাদেবীকে উর্বশী নামে উল্লেখ করা হত। গ্রীক রূপকথার কামনাদেবীর নাম ভেনুস (venus)। ভেনুস নামটি বৈদিক ভাষায় যথাযথ অনুবাদ করলে হয়'বন্‌স' অর্থাৎ বন্ ধাতুতে অস্ প্রত্যয় থেকে। লক্ষণীয় যে বন্ ধাতুর সমার্থক মন্ ধাতুতে অস্ প্রত্যয় করলে হয়, 'মনসা'। আমাদের ঐতিহ্যে পরবর্তীকালে কামনাদেবী হিসাবে মনসার আবির্ভাব ঘটেছে। এ আমার ব্যাখ্যা নয়; পণ্ডিতপ্রবর ডঃ সুকুমার সেন ব্যক্ত করেছেন। অধঃপতন ঘটেছে উর্বশীর।

কাম শব্দটির ব্যাপক অর্থ কালক্রমে আসঙ্গলিপ্সা বোধক হয়ে পড়ায় কামদেব বা কামদেবী সম্পর্কেও ধ্যানধারণা এইভাবে সীমিত হয়ে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। উর্বশীর দুর্ভাগ্য এখানেই। নতুবা ঋক্‌বেদ উল্লিখিত অপসরস্ বহু জন নয়, একজন মাত্র; পরবর্তী পর্যায়ে শুধু বহুজনেই পরিণত হয় নি; বহুবল্লভাও হতে হয়েছে।

আগেই বলেছি নারায়ণের উরু হতে উর্বশীর জন্ম।

এই নারায়ণের স্বরূপ কি?

খুঁজতে গেলে মন চলে যায় বেদ গ্রন্থণ'ব কালে। বেদ অপৌরষেয়। ধর্ম তত্ত্ব থাক, তাই বলে অধর্মও করব না।

ইতিহাস যারা রচনা করেন পুথি, শিলালেখ প্রভৃতির নানা সুত্রের খেই ধরে কালের চাকায় চুর্ণিত ছোট ছোট তথ্যের সমন্বয়ে, চালগুঁড়ি দিয়ে মেয়েরা যেমন পুতুল গড়ে তেমনি ভাবে এই সব পণ্ডিতগণ আমাদের বুঝতে ভাবতে শিখিয়েছেন একদা এক মানব-গোষ্ঠী বর্তমানের তুষারাবৃত সাইবেরিয়া অঞ্চলের ভোল্‌গানদের প্রান্তদেশ হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিল নতুন বসতির সন্ধানে। হয়ত জন-বিস্ফোরণের জন্য অথবা খাদ্যাভাবের কারণে। এরা বর্তমান মিশরের নীলনদের তীরে এসে থামল, কালে স্থায়ীও হল। এদের একটি দল পরবর্তীকালে বর্তমান পামীর মালভূমি অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এরাই আর্য নামে

অভিহিত হয়। অগ্নি এদের উপাস্য, যজ্ঞই হল বিভিন্ন দেবতার স্বরূপ। আর সেই সকল যজ্ঞ ও দেবতাগণের ক্রিয়া সম্পাদন ক্ষমতা অর্থাৎ শক্তিই দেবীরূপে আখ্যায়িত হল। এরা ছিল সমাজবদ্ধ জীব। পশুপালন, শিকার, বনজ ফলমূল আহরণ ও সহজাত আয়াসসাধ্য কৃষিকাজ ছিল উপজীবিকা। একালে এসব তত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত। দল তথা সমাজের নেতৃত্বে তখন এসেছে পুরুষ, নারী অবহেলিতা না হলেও নানা বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িতা; যা পরবর্তীকালে সঙ্কুচিত হতে হতে নারীকে পণ্য ও ভোগ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করে তুলেছে।

এই মানবগোষ্ঠী, পণ্ডিতের অনুমান সঙ্গে এনেছিল বেদ। বাল্মীকির কণ্ঠ হতে সহসা উদ্‌গীত শ্লোকের মতই বেদ ও দেব বন্দনার স্বয়ং উদ্‌ভূত মন্ত্র; অপৌরষেয়।

সেই কাল, চতুর্বেদের মধ্যে প্রাচীনতম ঋক্‌বেদের উল্লিখিত নানা মন্ত্রের বিশ্লেষণ করে কেট্‌কার নামে এদেশীয় এক মহাপণ্ডিত প্রমাণ করেছেন, সেই কালে ভাদ্রপদ নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যভাগে উত্তরায়ণ অনুষ্ঠিত হত· অর্থাৎ আজ হতে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। এই ভাদ্রপদ নক্ষত্র পরবর্তীকালে পূর্ব এবং উত্তর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্র দু'টি নক্ষত্র হিসাবে ব্যোমমণ্ডলের তারাচক্রে গণিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে পৌষমাসকে বলা হয় তপঃ। এই মাসের আদিত্যের নাম নারায়ণ। পৌষমাস অর্থাৎ পৌষ পূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয় চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্রে এবং রবি উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে। কালক্রমে রাশি শব্দটির প্রয়োগ শুরু হলে পৌষমাসকে ধনুরাশি হিসাবে গণ্য করা হল; এই রাশিটিকে যেমন অশ্বদেহ অথচ মনুষ্যমুণ্ড জনৈক ধনুর্বিদ কল্পনা করা হয়েছে, তেমনি এই রাশি মধ্যস্থ মূলা নক্ষত্রের দশটি তারাকে অনন্তনাগের দশটি মস্তক এবং পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরষাঢ়া নক্ষত্রের তারাগুলির সমন্বয়ে কল্পনা করা হল অনন্তনাগ শয্যায় শায়িত তপঃরত এক দিব্য পুরুষের। এই দিব্যপুরুষই রবি তথা ইন্দ্র তথা

বিষ্ণুর উপস্থিতিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে আদিত্য-স্বরূপ নারায়ণে কল্পিত হয়েছে। এই নারায়ণ কিন্তু পুরাণ কাহিনীর ঋষি নর ও নারায়ণ হতে স্বতন্ত্র। যদিও উর্বশীর আবির্ভাবের কাহিনী একই।

একটি জ্যোতিস্ক প্রবহ ধনুরাশিকে প্লাবিত করে ছায়াপথের সঙ্গে মিশেছে। এই নৈসর্গিক অবস্থাকে কল্পনা করেই নারায়ণের উরু হতে উর্বশীর উদ্ভব কাহিনীর অবতারণা। অর্থাৎ, উর্বশীর আবির্ভাবের বহুপূর্ব হতেই খ-মণ্ডলের ছায়াপথ তৎকালীন মানুষের মনে যে রেখাপাত করেছিল সেই ধ্যান হতে প্রথমে কল্পনা দানা বাঁধে 'অপসরস্'-এর। তখন সমগ্র ছায়াপথটিকে একটি সত্তা অর্থাৎ নদীস্রোত-ন্যায় ভাবনা ছিল। কিন্তু নিত্য নতুন কাহিনী সৃষ্টি এবং ধ্যানধারণার বিস্তৃতির দরুণ অপসরস্ অর্থাৎ অপ্সরা উর্বশী নামধেয়া হল। এই এক অপ্সরা, মানুষের ধীশক্তি যখন ছায়াপথে সংখ্যাতীত তারার অস্তিত্ব অনুধাবন করল এবং দেখল বিভিন্ন ঋতুতে ছায়াপথের বিভিন্ন অংশ দৃশ্যমান তখন একটি সত্তা শুধুমাত্র উর্বশীতে সীমায়িত না থেকে বহুধা হয়ে রম্ভা, ঘৃতাচী, ক্ষেমা, অলম্বুষা, প্রমদ্বরা, মেনকা, প্রমুখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল। অপঃ থেকে জন্ম বলে অপ্সরা নাম। রামায়ণের সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে বলা হয়েছে মন্থন কালে ষাটকোটি অপ্সরা উঠে আসে। দেবতা বা দানব কেউই এদের নিতে চায় নি। ফলে এরা না দেবী, না দানবী। তবু এরা পুরাণ ইত্যাদিতে দেবযোনি হিসাবে উল্লিখিতা; কামদেব এদের অধিপতি। লক্ষণীয় যে ইন্দ্রও এদের উপর কর্তৃত্ব করছেন, গন্ধর্বরাও দাবীদার নানা আখ্যানে। অপ্সরা নিয়ে পুরাণকাররাও দেখা যায় মুক্ত-কচ্ছ। ফলে অপ্সরার উদ্ভব ও সংখ্যা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। সে এখন থাক। আপাততঃ রামায়ণের কাহিনীদৃষ্টে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সহজেই বলা যায় তৎকালে প্রাজ্ঞজন বুঝেছিলেন ছায়াপথ মূলতঃ পুঞ্জীভূত তারকারাশি। যা গণনার

সীমায় বাঁধা যায় না, তাকে বৃহত্তর অবিশ্বাস্য সংখ্যায় উল্লেখ করে সীমায়িত করার প্রয়াস নেওয়াই বুদ্ধির পরিচায়ক।

আদিকবি অপ্সরার এই কাহিনী রচনা করার বহুকাল আগেই অপ্সরার ধ্যান প্রকাশ পেয়েছে ঋক্‌বেদের একটি সুক্তে ; প্রত্যক্ষভাবে না বললেও পরোক্ষে যে ইংগিত দেওয়া হয়েছে সেই স্তুতি অপ্সরার প্রতিই প্রযোজ্য। তখন অপ্সরা একজনমাত্র এবং এই একক অপ্সরার পাশাপাশি একজন মাত্র গন্ধর্বর অস্তিত্বকেও স্বীকার করা হয়।

এই অপ্সরা এবং গন্ধর্ব পরবর্তী বৈদিক শাস্ত্রে একাধিক হতে হতে কালক্রমে সম্প্রদায় বিশেষে পরিণত হয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নাই।

ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্তে যে দেবীর বা দৈবশক্তির ইংগিত আছে তিনিই পরবর্তীকালের ভাবনায় বিদ্যাদেবী বা সরস্বতীর মত, কবিদের প্রেরণাদাত্রী। একটি শ্লোকে তাকে নির্দশ করা হয়েছে 'গৌরী' বলে। গৌরী শব্দের অর্থ গিরিনদী হতে পারে। আজও মাঘী শুক্লাপঞ্চমীতে সরস্বতীর আরাধনা হয়, র ব তখন মকররাশিতে বর্তমানের শীতঋতু।

কিন্তু বেদের কালে বাসন্তবিষুব যখন ছিল মৃগশিরা নক্ষত্রে তখন কিন্তু ধনুরাশি শরৎঋতুর অধীনে। সেকালে তিন ঋতুতে বর্ষ গণনা হত। দক্ষিণায়ন হতে চার মাস বর্ষা, পরবর্তী চারমাস হিম বা শীত এবং শেষ চার মাস গ্রীষ্ম। ছয় ঋতুর প্রচলন হওয়ার আগে বা পরে শারদবিষুবতে রুদ্রযজ্ঞ যেমন হত, তেমনি বর্ষা ঋতুর শেষে গুরুগৃহে পাঠ্যারম্ভ হত। এই সূত্রে সরস্বতীর আরাধনা, তখন রাত্রির আকাশে ছায়াপথ জাজ্বল্যমান। ঐ দীপ্তিময়ী শুভ্র জ্যোতিষ্কপ্রবহ কালক্রমে সরস্বতী নামে অভিহিতা যেমন হয়েছে, তেমনি নৈসর্গিক সরস্বতীর স্মরণে ভূতলে ভারতবর্ষের সেকালের শ্রেষ্ঠা নদীর প্রতীকি নামকরণ ঘটেছিল সরস্বতী নদী। এই গিরিনদী হিমালয় পর্বত হতে উৎপন্না।

উর্বশীর জনক নারায়ণকে খুঁজতে ব্যোমমণ্ডল তোলপাড়; সূর্যর অয়ণের পিছনে ধাওয়া করে একাল হতে সেকাল উতরে আর্যগণের আবাসে কালগণনা। একটা ধান হতেই ত পাঁচশ ধান, যদি ঠিক ঠিক পরিচর্ষা করা হয়। অতএব বুকে আগুণ জ্বালানো এক উর্বশী বহু আখ্যানে বহু-রূপা হবে এ আর নতুন কথা কি। তবে আদিকবি যেমন অযোনিসম্ভবা সীতার একটা বাবা খুঁজে দিয়েছেন, তেমনি উর্বশীরও একটা বাবা ছিল। অতএব বিশ্বকবির 'নহ কন্যা' চিন্তায় কেমন যেন খোঁচা দেয়।

নিঃশব্দে মনকে ধমক দিই,—রাখো তোমার ভ্যানতারা। আর জ্ঞান দিতে হবে না। কালো জমিনে রূপালী বুটিদার জামদানি শাড়ীর মত রাতের আকাশের লক্ষকোটি তারা নিয়ে নানান রূপের চিন্তা করা যায়। যে কোন চিত্রকেই খণ্ডবিখণ্ড করলে হাজারো বিন্দুতে পরিণত হয়। অত বড় যে চাঁদ তার বুকেও ত ছবি আঁকা আছে।

মনে পড়ে সেই ছোট বয়সে মা ঠাকুমা পূর্ণিমার চাঁদের দিকে আঙ্গুল তুলে বলত,—ঐ দেখেছিস কেমন পেঁজা তুলোর মত এলোচুলে জটাই বুড়ি চরকা কাটছে।

শুনে শুনে দেখতে দেখতে সত্যিই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল চাঁদের মধ্যে জটাই বুড়ি আছে। তারপর বড় হয়ে জেনেছি যে ছোপগুলোর অনুসরণে জটাই বুড়ির কল্পনা ওটা আসলে চাঁদের কলঙ্ক, মৃত সমুদ্রের খাত, যেখানে সূর্যের আলো বিকীরিত হয় না। জটাই বুড়ির চরকায় সুতো কাটার লোককথাটা চালু হয়েছিল কোন্ সময়? কালের কোঠীতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন যখন দানা বাঁধছে। গোপনে বা প্রকাশ্যে ঘরে ঘরে তকলিতে তখন সুতো কাটার ধুম। মুকুন্দদাসের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে" ঝড় তুলেছে বাংলার বুকে। সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক ধ্যানটা এমন সাড়া তুলেছিল যে বাঙ্গালী মায়েরা চাঁদের বুকে জটাই বুড়ির

কল্পনা করে চরকায় তুলো হতে সুতো তৈরীর একটা ধারণা পরবর্তী প্রজন্মের মনে গেঁথে দিচ্ছিল। যেমন করে ব্রতকথা লোককথা স্থায়ী আসন দখল করেছে।

অথচ নিজের বাল্যকালের ধ্যানধারণায় একবিংশ শতাব্দীর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে এই প্রজন্মর ছয় বছরের নাতনিকে সেই গল্প বলতে গিয়ে গাধা অপবাদ শুনতে হয়েছে। সাফ বলে দিল,—তুমি কিছু জানো না। টিভিতে চাঁদের ছবি দ্যাখোনি।

বুঝেছি। আর নতুন করে রূপকথা পুরাণকাহিনী ব্রতকথা রচিত হবে না। শুনতে পড়তেও কেউ চায়না। একালের বাল-খিল্যদের ওসবে মন নাই। এখন চাই অরণ্যদেব, কমিকস্, কুইজ ইত্যাদি ইত্যাদি।

তেমনি আমারও মন ভরে না জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঐ কচকচানিতে। তার চেয়ে রসেবসে জারানো পুরাণের গপ্‌পো অনেক ভাল। মস্তিকে এখন উর্বশী মানে অপ্সরা-চিন্তা। ওরা ত যেমন তেমন নয়, দেমাকে মাটিতে পা পড়তে চায় না। মাছের মত হেলায় জলে সাঁতার কাটে, যখন তখন ভেসে বেড়ায় শূন্যে। মাঝেমধ্যে বিপত্তি ঘটায় রসিকনাগর পবনদেব, ইন্দ্রের দোসর, যিনি অপ্সরা নিয়ে যত নচ্ছারির নাটের গুরু। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র মনের ক্ষোভে তপস্যা করছেন ব্রহ্মবল লাভের জন্য। ইন্দ্রত্বর প্রত্যাশা ত নয়, তবে কেন তোর কাঠিনাড়া। ডাক পড়ল মেনকার বিশ্বামিত্রকে উচিত শিক্ষা দিতে। 'যথা আদেশ প্রভু' এই বলেই অপ্সরার শূন্যে ঝাঁপ। ইন্দ্র উস্‌কে দিল পবনদেবকে যার স্বভাবটি আবার ছুঁকছুঁকে, আজকের দিনের 'ইভটিজার'দের মত। গায়ে গা বুলিয়েই আনন্দ। আদেশ পেয়ে তিনি পিছু নিলেন মেনকার, যে তখন নতুন রঙ্গে ডগমগ আনন্দে ভেসে চলেছে। দু হাত প্রসারিত, যেন নীল আকাশের ভাসমান চিল। অন্তর্বাসহীন, চীনাংশুক শাড়ীর প্রান্ত উড়ছে মদমত্ত রাজার রথের ধ্বজার মত। বিশ্বামিত্রের আশ্রমের আঙিনায় পা রাখতেই

পবনদেব প্রথমেই স্বভাবসুলভ ঝট্‌কায় আঁচল দিল ফেলে'। এতেও সুখ নেই, নীবিবন্ধে টান পড়তেই মেনকা বিবসনা। যতই হোক নারী ত। লজ্জানম্র কণ্ঠে সুর বেজে উঠল, বরতনুর হিন্দোলে অভিনব অভিব্যক্তি আড়ালের বদলে উদ্ভাসিত করে দিল আপনাকে। তখন সন্ধ্যালগ্ন। দিনান্তে শেষ সূর্য প্রণামের উদ্দেশ্যে ঋষিবর সন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। কিন্তু কোথায় দিনকর? সমুখে হেরিনু দীপ্ত বহ্নিশিখা। তবু অভ্যাসবশে নিজেকে সংযত করে উচ্চারণ করলেন, — ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ·

আর মনে পড়ে না, স্মরণে আসে না অস্তাচলে দিনশেষে ক্লান্ত অরুনাভ দিবাকরের স্বরূপ। সামনে শুধু ব্রীড়াবনত দুটি আঁখি খঞ্জন বিহঙ্গসম, কপোতীর উষ্ণ নরম বক্ষের তাপ। মন্ত্র স্তোত্র হোম চিন্তায় আসে না। অনাস্বাদিত অভিনবতরঙ্গে সর্বাঙ্গ থরথর: ভাবনায় ধরা দেয় না সূর্যবন্দনার পরবর্তী চরণ। ঋষিবরের অস্ফূট বাক্ উদ্‌গীরণ. - মহাদ্যুতিং দ্যুতিং ·· দ্যুতিং

এই দ্যুতি, এই জ্যোতি. এই বহ্নিশিক্ষা সম্মোহিত করছে ঋষিকে. সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে হল খান খান। অঞ্জলিবদ্ধ হাত নিঃসারে স্পর্শ করল অপ্সরার পাদপদ্ম। নতুন মন্ত্র উদ্‌গীত হল, হে দেবী! হে অপ্সরে! আমি ব্রহ্মবল চাই না। তুমিই মহাশক্তি, সর্বজীবের ধা'ত্রী। সৃষ্টিপালিকা। ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তি তোমাতে নি'হিত। তুমি আমাকে কৃপা কর, পরিপূর্ণ কর, প্রকাশিত কর, প্রাণময় কর।

মেনকার ওষ্ঠপ্রান্তে জয়গর্বিত মৌন সম্মতির অপরূপ ভঙ্গি। বিশ্বামিত্রের তপ লীন হয়ে গেল মেনকার যৌবনউদ্ধত দেহবল্লবীর আড়ালে।

দীর্ঘ দশ বছর, তবু যেন মনে হয় মুহূর্তমাত্র। বিশ্বামিত্রের মোহভঙ্গ হল। অভিশাপ আশংকায় মেনকা কম্পমান বেতসলতার মত। ক্ষমা কর হে রুদ্র তাপস। মুক্তি পেয়ে ফিরে গেল স্বস্থানে। বিশ্বামিত্রও স্থান ত্যাগ করে উত্তরে গেলেন নতুন করে তপস্যার

কারণে। বহু বছর পরে সেখানেও বিপত্তি। আবার ইন্দ্রের কারসাজি। এবার অন্য অপ্সরা, রম্ভা। ততদিনে বিশ্বামিত্র দেহতত্ত্বের আবিলতা হতে মুক্ত হয়ে নির্বিকল্প। অপ্সরা-দর্শন মাত্র অভিশাপ দিলেন,—তুমি পাষাণ হও।

রম্ভা পাষাণে পরিণত হল ?

এ কেমন কথা হল।

মন বলল,—বুঝলে না ত। পুরাকথার এই মজা। বেদের সরলীকরণ উপনিষদ আর উপনিষদের সাধারণীকরণ পুরাণ। এ হল গুরুমুখী। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নবরসের ভিয়েনে সারকথা। মিষ্টির মোড়কে কুইনিন; আপাত মিষ্ট কিন্তু তিক্ত মহৌষধি। সাধারণ জীবনের হাসিকান্না সুখদুঃখ, আশাপ্রত্যাশা অনুভূতির আধারে বানানো কাহিনীর আড়ালে লুকানো দিব্যজ্ঞান।

ঠিক বুঝলাম না।

এই বুদ্ধির দৌড়। মেনকার আবির্ভাবে দেহভাবের দরুণ উদ্দেশ্য হয়েছিল ব্যাহত। আর সেই শিক্ষা পেয়ে কামশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি। ফলে রম্ভার ছলাকলা বিফলে গেল। তাকে পাষাণ হতে হল; অর্থাৎ যা অধিগত তার চর্বিতচর্বনে প্রয়োজন কোথায়।

ওহে মন! জ্ঞান দিও পরে। আমি উর্বশীর সন্ধানে আছি; এখন ওসব ছাড়ান দাও।

ভাল। কিন্তু জেনো পুরাণের গল্পে ডুব দিলেই বুদ্ধি ঠেকবে মূল তত্ত্বে।

মন তুমি লাগাম টানো। খোঁচা যে চোখে লাগছে এখন বড় বেশী। সামনে অধিষ্ঠিতা একালের উর্বশী। চাইছি তাকে পরিপূর্ণভাবে অবলোকন করতে, কিন্তু পারছি না। দেহের অভ্যন্তরে কোথায় তার বাস জানি না, হয়ত সহস্রায়, সেই আমার দ্বিতীয় সত্তা আমার ধ্যানকে শুধুই পিছনে ফিরিয়ে রাখছে। যতই তাকে বলি, থাক না তোর যুক্তি - তর্ক—তথ্য; কিন্তু কে কার কথা শোনে।

অতএব একালের উর্বশীর সামনে বসে সেকালের উর্বশীতে আমি মজেছি।

উর্বশী!

সরস্বতীর স্বরূপ এবং তারই পূর্ববর্তী রূপ বাক্ যার ইংগিত রয়েছে ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে ও ধ্বনিত হয়েছে অথর্বসংহিতায় এবং পরিশেষে বৈদিক গদ্য সাহিত্যে গল্পের রূপ নিয়ে কালান্তরে সরস্বতী ও বাক্ একই সত্তায় বন্দিতা হল, এই দেবীকে বিন্দুমাত্র আসনচ্যুত না করেই বলা যায় এরই মুল স্বরূপ ছিল অপ্সরা। আকাশের নক্ষত্র ছিল বৈদিক ভাবনার দিগ্‌যন্ত্র, সুতরাং বিভিন্ন নক্ষত্রের উদয়াস্ত পর্যবেক্ষণ করে ঋতুর গমনাগমন যেমন নির্দিষ্ট হত, তেমনি বিভিন্ন যজ্ঞকালও নির্ধারিত হত।

বৈদিক সমাজে মূর্তির প্রচলন ছিল না, কিন্তু কোন কোন সূক্তে কোন নৈসর্গিক ঘটনার দেবরূপ অথবা সেই দেবতার শক্তিকে দেবীরূপিনী হিসাবে কল্পনা করে প্রতিমা অর্থাৎ আলেখ্য অঙ্কনের ভাবনা রাখা হয়েছে। এই ভাবনাকেই বলা যায় পরবর্তীকালের মানুষের কল্প-কাহিনী সৃষ্টি এবং মৃত্তিকা, দারু অথবা শিলামূর্তি গঠনের বীজ স্বরূপ।

মূর্তি থাক, থাক আলেখ্য। বীজ অবস্থার ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পাই একদা মানুষ রাত্রির আকাশে, সন্ধ্যা ও উষাকালে বিভিন্ন ভাবে ছায়াপথকে দেখে চমকিত হয়েছিল, বিস্মিত হয়েছিল, আদি শ্লোকের আকস্মিক উদ্‌গীত হওয়ার মতই তারাও হয়ত সহসা উচ্চারণ করেছিল—অপ্সরস্ অর্থাৎ প্রবহমানা। রাত্রির আকাশের এই চিত্রবিচিত্র রূপ শুধু সে প্রজ্ঞাবান মানবগোষ্ঠীকেই চমকিত ও ও ধ্যানস্থ করেছিল তা নয়, আদিম কাল হতে জান্তব মানুষের জ্ঞানোন্মেষের উষালগ্ন হতেই এই আকাশ, এই সূর্য, এই চন্দ্র, তারা গ্রহ, সকলেই এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে।

দিনে সূর্যর রশ্মিবিচ্ছুরণে পৃথিবীপৃষ্ঠ আলোকিত, সেখানে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু সূর্যাস্তের পর আকাশের ভোজবাজী। ত্রিশ তিথিতে চন্দ্রের ত্রিশ দশা চিন্তার খোরাক জুটিয়েছে মানুষকে আদিমতম কাল হতে। বারো মাসে আকাশের বিরাট সামিয়ানায় ফুটে উঠেছে তারারাশি দিয়ে সাজানো কল্পিত নানা স্বরূপের দৃশ্যপটের পরিবর্তন। দিগন্তপ্রসারী বরাঙ্গী ছায়াপথের দেহে লুটিয়ে পড়া কালপুরুষ পূর্বাকাশে উদিত হয়ে অহোরাত্র, সপ্তাহ, পক্ষ, মাসের ঘূর্ণণে এক সময়ে হারিয়ে যায় পশ্চিম আকাশের দিগবলয়ে।

আদিম মানুষ সজাগ সতর্ক দৃষ্টিতে রাতের আকাশের এই মায়াজালে কৌতুহলী হয়ে কার্য্যকারণ জানতে শেখে। বুধগণ সত্যকে উদ্ধার করে সৃষ্টি করেন মন্ত্রের আর সেই মন্ত্রের দুর্বোধ্যতাকে গুরুমুখী বিদ্যার অধীনে রাখায় পুরাণকার সাধারণ মানুষের জন্য রচনা করেন নানা কল্পকাহিনী রসশ্রেষ্ঠ আদিরসের জারকে। গল্পে গল্পে মূল সূত্র গেল হারিয়ে, গল্পই শেষে সত্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল চারণকবির গানে ও ছন্দে।

এই অবস্থা আমারও। ধাপে ধাপে উর্বশীর নানা রূপবদলে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। এমনি করেই সেই আদিম যুগে, আজ হতে বিশ ত্রিশ হাজার বছর আগের কালে, এক আদিম মানব-গোষ্ঠীর পলাতকা নেত্রী হারিয়ে গিয়েছিল। সেই ভেসে যাওয়া উদ্‌বিড়ালীর শেষ আশ্রয় কি কিছু ছিল না, যেখানে বসে নিশ্চিন্তে সে জলে-ভেজা দাঁতে-কামড়ানো ঝল্‌সানো মাংসের টুকরোর হাড় পর্যন্ত ধীরেসুস্থে চিবিয়ে রসিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খাবে? কয়েক যুগ ধরে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত আদিম মানবযুথের কত শত সহস্র নেত্রীকে এমনি ভাবেই স্বেচ্ছানির্বাসনের পথ বেছে নিতে হয়েছে। সকলেই কি খরস্রোতা জলধারায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তলিয়ে গিয়েছে অথবা ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে বা জলজ হিংস্র জন্তুর ক্ষুধার শিকার হয়েছে?

ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ঘটেছে। কল্পকথার নেত্রীর ভবিতব্য চিন্তা করতে গিয়ে মনে পড়ে কয়েক দশক আগে হাল আমলে আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলের চিনাকুড়ি খাদের ভিতরে আকস্মিক জলপ্লাবনে বহু শ্রমিকের জীবন হানি ঘটেছিল। ঘটনারও অঘটন ঘটে। সেই মর্মন্তুদ ঘটনায় দেখা গিয়েছে একদিন নয়, দুদিন নয় পুরো একুশদিন ধরে একজন দুজন নয় এগারোজন শ্রমিক প্রাণে বেঁচে রয়েছেন। অদ্ভুতভাবে তারা আশ্রয় পেয়েছিল এমন জায়গায় যে স্থান জলে ডোবেনি, অভাবিতভাবে সেখানে ছিল বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল, প্লাবনের জল ছিল না বিষাক্ত, সেই জলে তারা পেয়েছিল ছোট ছোট মাছ যা তাদের ক্ষুধার উপশম ঘটিয়ে জীবনীশক্তিকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

এই জাতীয় অঘটন আদিম যুগেও ঘটেছিল নিশ্চয়ই। নতুবা সেই উদ্‌বিড়ালী সারারাত্রি খরস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভোরের আলোয় কেমন করে দেখতে পেয়েছিল চোখের সামনে বিরাট এক পাথরখণ্ড মাথা তুলে রয়েছে। আর তখনই তার পায়ের নীচে শক্ত পাথরের স্পর্শ পেয়েছিল। প্রথমে ছোঁয়া, তারপর দাঁড়ানোর মত অবস্থা, পরিশেষে হামা দিয়ে জল হতে পরিত্রাণ লাভ। শক্ত কঠিন পাথর, জলের চেয়ে পাথরের উপরিভাগের তাপ বেশী। প্রাণহীন সেই পাথরখণ্ডের শীর্ষদেশে সে অসাড়ভাবে শুয়ে পড়ল।

তখন সবে ভোর হচ্ছে। নদীর দুকূলের খাড়া পাড়ের গভীর জঙ্গলে নানা পাখীর ঘুম ভাঙ্গানো কলতান। গাছের মাথার উপরে নতুন পাতার পিঠে অরুণবরণ সূর্যের সোনালী ছটা। সেই মুহূর্তে তার আগুনের কথা মনে হল। কিন্তু ক্লান্ত শরীর তখন নিশ্চল। ঘাড় ঘুরিয়ে অকারণে দেখল আগুন জ্বালার অরণীর কোন উপায়। বৃথা। নিষ্প্রাণ পাথরখণ্ডে দ্বিতীয় কোন পাথরের টুকরো তার চোখে পড়ল না। তবে এটুকু বুঝল এই পাথরখণ্ডটি চারিদিকেই সমভাবে ঢালু হয়ে জলে ডুব দিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। বেলা

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যতাপে আরামবোধ হল। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গল যখন তখন প্রথমেই চোখে পড়ল বিরাট একটা পাখী তার মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। আজকের দিনে পর্বত অভিযানে হারিয়ে যাওয়া মানুষের উদ্ধারের জন্য যেভাবে উর্ধ্বাকাশে হেলিকপটার পাক খেয়ে নেমে আসে লক্ষ্যবস্তু স্থির করে। বিপন্ন মানুষের উদ্ধারের নিশ্চিন্ততা।

এক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়, নেত্রীর চোখে আতঙ্ক। ঐ অজানা ঈগল-গোত্রীয় পক্ষীর শ্যেণদৃষ্টিতে সে দেখেছিল তার আসন্ন মৃত্যু। চকিতে শক্তশরীরে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং যেই পাখীটা বিমান অবতরণের ভঙ্গিতে ছোঁ মেরেছিল, সেই মুহূর্তে তড়িৎ-গতিতে একটু সরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাখিটার উপর। দুই হাঁটুতে ছড়ানো পাখাদুটো চেপে ধরে দু'হাতে শাড়াশীর ভঙ্গিতে কণ্ঠনালী চেপে ধরে দাঁত দিয়ে কবন্ধ করে দিয়েছিল; পান করেছিল ফিন্‌কি দিয়ে গড়ানো সদ্যমৃত পাখীর উষ্ণ রক্ত।

এখন পাখীটা ডানা ছড়িয়ে নির্জিব পড়ে আছে। তার হাতে ঠোঁটে চিবুকে রক্তের ছোপ। আগুন পেলে ভাল হত। তা না হোক; কাঁচামাংসই জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এভাবে কতদিন?

দিনের হিসাব ত সে জানে না। তবে রাতের আকাশে দেখেছে একফালি চাঁদ ধীরে ধীরে স্থূল হচ্ছে।

একদিন সে দেখল বিরাট একটা গাছ ভেসে আসছে নদীর স্রোতে। সে ঝাঁপ দিল জলে। একটা ডাল চেপে ধরে আশ্রয় নিল নিরাপদ উচ্চতায়। আবার হারিয়ে যাওয়ার যাত্রা, একটা কূল পাওয়ার প্রত্যাশা, বাঁচার তাগিদ, মানবগোষ্ঠীর সঙ্গ কামনা। নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত করে সে দেখল ভেসে যাওয়া গাছে সে একা নয়। নানাধরণের জীবজন্তু সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। বড়ই অদ্ভুত।

সকলের চোখেই উৎকণ্ঠা। খাদ্য-খাদকের পাশাপাশি অবস্থান। বাঁচার লড়াই-এর অভিনব কৌশল।

এতক্ষণে নেত্রীর চোখমুখে হাসি ফুটল। নিরাপদ আশ্রয়, পর্যাপ্ত শিকার। এখন তার দৃষ্টি নদীকূলের দূরত্বের মাপ করছে। ঐ শক্ত মাটিতে আশ্রয় পাওয়ার বাসনা, যদিও জানে না সেখানে কি আছে, কি ঘটবে।

একদিন একরাতের জীবন কেটেছে গাছের ডালে বসে ভাসতে ভাসতে নদীস্রোতে। তারপরই আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। নদী এখন আগের মত বেগবতী নয়, দুকূল খাড়া পাহাড়ে বেষ্টিত নয়, পদে পদে নদীগর্ভে পাথরখণ্ডের সঙ্গে ভাসন্ত এই যানের সংঘাত নয়। নদী রূপ বদল করেছে। দু'তীরের নরম মাটির ঢালু জমি উপরের বনভূমির সঙ্গে মিশেছে। মাঝে মাঝে বেলাভূমিতে বালু-রাশির আচ্ছাদন। নেত্রী ঝাঁপ দিল জলে। যতটা সহজ মনে হয়েছিল সাঁতার কেটে তীরে ওঠা, তা আদৌও সত্য ছিল না। হয়ত বিগত কয়েকদিনের শারীরিক নির্যাতন, আর প্রায়-অভুক্ত অবস্থা তাকে নিরাশ করে তুলেছিল। আগের মত হাতপা ছুঁড়ে তীর্যক গতিতে জলস্রোতের বাধা এড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে প্রায়ই অবসন্ন হয়ে ডুবে যাচ্ছিল। তবু শেষ চেষ্টা, মরণপণ যাকে বলে, সেই ইচ্ছাশক্তিতে শেষ পর্যন্ত পায়ের নীচে নরম মাটির স্পর্শ পেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে দম নেওয়ার চেষ্টা করল। নরম মাটিতে পা বসে যাচ্ছে। কোনও রকমে বাহু তাড়নে এগিয়ে গিয়ে তীরভূমির শক্ত মাটি দুহাতে খামচে হামা দিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে জল হতে তুলে নিতে প্রয়াসী হল। পারল না। কটিদেশ হতে নিম্নাঙ্গ জলের আড়ালে, উদভ্রান্ত হয়ে একপাশে মাথা হেলিয়ে জ্ঞান হারালো। দেহের যত্রতত্র কাদার প্রলেপ; খোলা পিঠের শুভ্রতায় ছড়ানো এক রাশি পিঙ্গলবর্ণ চুল।

আমি পত্রকারের বাচ্চুদিকে দেখছিলাম। ঘরোয়া পরিবেশের সাক্ষাৎকার হলেও মুখেচোখে প্রসাধনের কিছু কমতি নজরে পড়ল না। হাল্কা প্রসাধন, মাপা হাসি, ভ্রূ নাচিয়ে গা দুলিয়ে কথার জবাব; সব মিলিয়ে মনে হল এই এরা যারা রূপালী পর্দার উজ্বল তারকা, এরা বোধহয় অভিনয় করে করে সাবলীল সহজাত অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে ভুলেই গিয়েছে। কোলের লোমশ একমুঠো কুকুরটা কেদারার হাতলের উপর বসে, অপরটি অপর পাশে উর্ধমুখে হয়ত বা নায়িকার হাবভাবে চোখ টিপটিপ করছে। রেশমী শাড়ীর আঁচল ক্ষণে ক্ষণে স্থানচ্যুত হয়ে বাতাসে একখণ্ড মেঘের মত উড়ছে। ঘরোয়া পরিবেশ, অতএব আঁচল সামলাতে ব্যস্ততা কিছু নাই; এজন্য ব্রীড়া-বিমূঢ়তার স্পন্দনে চোখের তারা নিজের বুকের দিকে নজর টেনে সলজ্জ শাসন করে না। মুখোমুখী বসে আছি। উর্বশী অর্থাৎ বাচ্চুদির পটভূমিতে খোলা দরজার ওধারে বিগলিত করুণা গঙ্গা। উড়ন্ত আঁচল যেন নদীর ছোট ছোট তরঙ্গ ভঙ্গে মিলেমিশে এই মুহূর্তে আমার সামনে বসে থাকা মানবীকেও বহতা গঙ্গার অঙ্গ করে তুলেছে।

আমাদের বাড়ীতে বড় একটি রঙ্গীণ চিত্রপট ছিল শান্তনু ও গঙ্গার প্রথম সাক্ষাৎকারের, বোধহয় প্রখ্যাত শিল্পী রবি বর্মার শিল্পকর্ম। সেই পটের সালংকারা গঙ্গার রূপলাবণ্য কিশোরকালে মনে এমন দাগ কেটে দিয়েছে যে সে সময়ে কতদিন ভেবেছি অপ্সরাগণও হয়ত এমনিভাবে পুরাণের যুগে পুরাণকারের চোখের সামনে জলস্রোত হতে ভেসে উঠত।

জানি না, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এ বছরের উর্বশী পুরস্কারপ্রাপ্তা রূপালী পর্দার পদ্মিনী পত্রকারের বাচ্চুদি সত্যই বোধহয় সেকালের সেযুগের অপ্সরা শ্রেষ্ঠা উর্বশী ছিল। কোন সারমেয় পুঙ্গব নয়, যেন দু'পাশে দু'টি মেষশাবক। আমরা তিনটি প্রাণী নই, যেন উর্বশীর তিন সর্ত্তাধীনে আবদ্ধ এক সত্তায় পুরূরবা রূপে বিদ্যমান।

পুরাণকার বলেননি পুরূরবার ক'টি চোখ ছিল। কিন্তু ওরা যখন এতই কল্পলোকে বিচরণ করতে পেরে থাকেন তাহলে উর্বশীর প্রথম দর্শনের চমকে পঞ্চইন্দ্রিয় ও মন এই ছয়ে মিলে পুরূরবা নিশ্চয়ই বিস্ফারিত ষড়-সত্তায় উর্বশীর রূপ-আসবে বিমূঢ় হয়ে সমাধিস্থ হয়েছিল এমন তথ্য উত্তরপুরুষদের জন্য রেখে যেতে পারতেন। পুরূরবার উর্বশীর সান্নিধ্যে কি অবস্থা হয়েছিল জানা নাই, কিন্তু আমরা তিনজনে এখন এক সূত্রে বাঁধা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। আমার কানে বাজছে সরস্বতী নদীর কলোচ্ছ্বাস। নিস্তব্ধ আশ্রম কানন। ঋষির নিষ্পলক দৃষ্টি ঊর্ধাকাশে। রবি বিশাখা নক্ষত্রে, কৌমুদী পূর্ণিমা। নির্মেঘ রাত্রির আকাশে ছায়াপথ সমুজ্জ্বল, দক্ষিণ দিগ্‌বলয়ে ছায়াপথের দুপাশে দুটি উজ্জ্বল তারা। কি নাম ঐ তারা দু'টির? শ্বন ও প্রশ্বন। শ্বন অর্থে সারমেয়। বেদমন্ত্রে ধ্বনিত হয়েছে ধর্মরাজ যমের নরকের প্রবেশদ্বারের প্রহরী দুই সারমেয়। আকাশের বিরাট চিত্রপটে ঐ আশ্চর্য দ্যুতিময়ী ছায়াপথ যার একপাশে শ্বন ও অন্য দিকে প্রশ্বন তারা দেখে কোনও এক কালে কোন কট্টর জীবনবাদী ঋষি হয়ত কল্পনা করেছিলেন দক্ষিণ দুয়ারের যমালয়ে যাওয়ার পথের বৈতরণী নদীর তরঙ্গভঙ্গ। শ্বন ও প্রশ্বন দুই সারমেয় প্রবেশদ্বারের অতন্দ্র প্রহরী।

আপন অজ্ঞাতে অপর ঋষির মাথা তুলে উঠল। কণ্ঠ হতে উৎসরিত হল,—না না। এ কখনই মৃত্যুর শীতল দুয়ার নয়; জীবনের পরিপূর্ণ উষ্ণতা। হিংস্রতার কোন দ্যোতক নয়। ও দু'টি নিরীহ মেষশাবক, বহমান জ্যোতিষ্কপুঞ্জ-স্বরূপা অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা উর্বশীর বড়ই আদরের ধন।

অভিশপ্তা উর্বশী মানবীরূপে পুরূরবার ঘরনী হয়েও তাই ওদের ত্যাগ করতে পারেনি। দাম্পত্য বন্ধন, আসঙ্গলিপ্সা ও গর্ভজাত সন্তানের প্রতি মাতৃত্বের মমত্বর চেয়েও ঐ মেষশাবক দুটির প্রতি তার আকর্ষণ যে আরও গভীর; এ যে শাশ্বত। ব্যোমমণ্ডলের

ছায়াপথ কোনদিন ত ঐ দুটি তারাকে ত্যাগ করতে পারবে না। তাহলে মানবী উর্বশীই বা কেমন করে ছেড়ে থাকবে মেষশাবক দু'টিকে।

রাত্রি গভীর। গহণ বন অজানা পরলোকের মতই আঁধারের জমাট একখণ্ড বালর নিস্পন্দ। ঋষি কৃষ্ণ সারাজীনে উপবেশন করলেন। প্রদীপ জেলে ভূর্জ্জপত্র টেনে নিয়ে বেদমন্ত্র হতে আহরিত অপ্সরার স্বরূপ আর তার অপর সত্তা উর্বশীর জন্ম-কথাকে কল্পনার আরকে মিশিয়ে রচনা করলেন উর্বশী-পুরূরবা কাহিনী ; রবির ক্রান্তি-পথের সকল নক্ষত্র ও জ্যোতিস্কপ্রবহের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ছায়াপথের প্রতিমা গড়ে তুললেন।

অথচ বৈদিক এই উর্বশীর অর্থ ভুবনপ্রেয়সী। এর পুরুষ নর্মসহচরের নাম বশিষ্ঠ, মানে প্রেমিকশ্রেষ্ঠ। ঋক্‌বেদে উর্বশীর সঙ্গে বশিষ্ঠর সহযোগের ইংগিত একাধিকবার আছে। এখানে উর্বশী কিন্তু পুরূরবার উর্বশী হতে স্বতন্ত্র। প্রেমে সে অচঞ্চলা, তদ্‌গতা, একনিষ্ঠা।

রাতের আকাশে আজও আমরা দেখতে পাই ছায়াপথের জ্যোতিষ্কপ্রবহে প্রসারিতহস্ত কালপুরুষ নক্ষত্র যুগযুগান্ত ধরে একই ভঙ্গীতে প্রেম প্রত্যাশী। এই কালপুরুষ নক্ষত্রকে মানতে হবে প্রথম বশিষ্ঠ, যিনি প্রেমিকশ্রেষ্ঠ।

হে নেত্র! এই বিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়েও আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে দেখবে বশিষ্ঠর ঘোর কাটেনি, উর্বশীও অনন্যা। উদ্‌ভ্রান্ত নিমগ্নচিত্ত দৃকপাতহীন এই যুগল বিশ্বচরাচরের সর্বজনকে অমৃতফলের রসাস্বাদন করাচ্ছে। বাক্‌হীন সোচ্চারে বলছে,—দেহ ত আধার মাত্র, যতক্ষণ লিপ্সা ততক্ষণ বন্ধন। অতএব দেহ নয় ; দেহাতীত প্রেম যা পরস্পরকে বিচ্যুত না করে আকর্ষণ করবে।

বাচ্চুদি আমাকে আকর্ষণ করছে। কি আছে ঐ মুখে যার পদ্মিনী নামের আকর্ষণে প্রেক্ষাগৃহ উপচে পড়ে, ধাপে ধাপে দাম বেড়ে যায় এই অভিনেত্রীর। একটু চোখের দেখার কারণে তাবকে পুলিশে সংঘর্ষ। এও এক আকর্ষণ বৈকি; বৈশিষ্টের আকর্ষণ। আমি বাচ্চুদির মুখে আদিমযুগের পলাতকা নেত্রীর ছায়া দেখলাম।

জ্ঞান ফিরতে সে দেখল একদল তারই মত নগ্ন নারী পুরুষ তাকে চারপাশে ঘিরে উল্লাস করছে। এদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, দেহ খর্বাকৃতি, দলিত নাসা, অশ্রুতপূর্ব ভাষা, এমন কি উল্লাসের অভিব্যক্তিও ভিন্নতর। সে বিস্ময় আর আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্র, ক্ষুধা আর পিপাসায় ক্লিষ্ট। তবু চমকের ঘোরে কেটে যেতে সে উঠে বসল। এতে উল্লাস বেড়ে গেল তাদের। সে ঈশারায় জানালো তার ক্ষুধার কথা। ওরা আরও উল্লসিত হয়ে তাকে মাংসের টুকরো, বনজ ফল খেতে দিল। কেউ কেউ অঞ্জলিবদ্ধ হাতের খর্পরে জল নিয়ে এল। সে ধাতস্থ হল। তখন দু'ধারে দু'জন নারী তার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। নিয়ে গেল সকলে মিলে বনের ভিতরে তাদের আস্তানায়। বিরাট বটবৃক্ষ, শত শত ঝুরি নেমে আপনা হতে সৃষ্টি হয়েছে শতাধিক মানুষের আশ্রয়স্থল। এতকালের অভিজ্ঞতায় পাহাড়ী গুহায় যে নিশ্চিন্ততা ছিল সেই একই অনুভূতি এই বৃক্ষ-গহ্বরে। অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত নিশ্চিন্ত নিবিঘ্ন আশ্রয়।

তারপর কেটে গেছে দিন মাস বৎসর। ওরা ত গুনতে জানতো না, শুধু রাতের আকাশের দৃশ্যপট পরিবর্তন অনুসরণ করত, অনুভব করত ঋতুর প্রক্রিয়া। এই হিসাবের সূত্র ধরে বহুবার রাতের আকাশে ছায়াপথের উদয়াস্ত ঘটেছে। সে তাদের সঙ্গে স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়েছে, ভাবের আদান প্রদানের অভিব্যক্তি আয়ত্ব করেছে, অনুভব করেছে আদিম জীবনের সহবাসের মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র।

কিসের স্বাতন্ত্র! তার আকস্মিক আবির্ভাব, আকৃতি প্রকৃতি ও গাত্রবর্ণের স্বাতন্ত্র এই কৃষ্ণবর্ণ মানবগোষ্ঠিকে ভাবতে শিখিয়েছিল আকাশের ঐ যে স্রোতধারা, যাকে আমরা এখন ছায়াপথ বলি, ঐ ধারা আকাশচ্যুত হয়ে ভূমণ্ডলে জলধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই দু'য়ের সম্মিলিত ধারা হতে ওদের মধ্যে তার আবির্ভাব। এখানেই স্বাতন্ত্র। এবং এই কারণেই এই মানবগোষ্ঠীতে তাকে নেতৃত্বের লড়াইএ নামতে হয় নি। সে শুধু অবলোকন করেছে তার আদি গোষ্ঠীর মতই এদের মধ্যেও একই পদ্ধতিতে নেতৃত্বের লড়াই। কিন্তু সে নিজে এসবের উর্ধ্বে, একান্তভাবে স্বতন্ত্র, যেন তার আসন নেত্রীরও উপরে।

তখনও আদিম মানবগোষ্ঠী পাশব প্রবৃত্তি উত্তরণ করে জ্ঞানের আলো আয়ত্ব করতে পারেনি। ঐশ্বরিক শক্তি বা ঈশ্বরজ্ঞান জাগেনি। নতুবা বলা যেত সে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা ছিল, যে দেবী জলধারা হতে স্বয়ং উত্থিতা।

একদা যখন জ্ঞানের উন্মেষ হল, মানুষ ঘর বাঁধতে শিখল, আয়ত্ব করল পশুপালন আর কৃষিকাজ, লজ্জার বিকাশ ঘটায় বল্কল আর পশুচর্ম পরিধান করল সেদিন কি তার শিরায় শিরায় আদিমতম কালের জলধারা হতে উঠে আসা এক অদৃশ্যপূর্ব অজ্ঞাত নারীর স্মৃতি রক্তকণিকার সঙ্গে বাহিত হয়ে পরিশেষে বিকশিত হয়েছিল অপ্সরার ধ্যানে?

বৈদিক ঋষি হয়ত সেই স্মৃতির পথ ধরে সহস্রাধিক বৎসর পরে রাতের আকাশে দীপ্তিময়ী ছায়াপথের পানে দৃটি রেখে স্বাগত উচ্চারণ করেছিলেন,—অপসরস্। তারপরই ধ্যানস্থ হয়ে দ্বিতীয় সম্বোধন করলেন,—উর্বশী।

এই একালে বিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়েও বিজ্ঞানের প্রসারতার মধ্যেও ঘরছাড়া বিদেশগামী সমুদ্রযাত্রী দূরে অসীম সাগরের বুকে ডলফিন নাম্নীয় জলজন্তু দেখে উল্লাসধ্বনি তোলে; ভাবে বুঝি বা

কোন জলদেবীর দর্শন ঘটল। তাই মনে হয় কল্পকথার দলছুট আদিম মানবী ভিন্নগোষ্ঠীতে আকস্মিক উপনীত হয়ে যে ধ্যানের সৃষ্টি করেছিল তা আজও মানুষের মন হতে মুছে যায় নি। জ্ঞান ও সভ্যতা নামক দু'টি বস্তুর ঘর্ষণে আমরা যত কলাকৌশল আয়ত্ব করে এগিয়ে চলেছি ভাবি না কেন; কিন্তু আদিম মানবী যে উদ্‌বিড়ালীর মত ভেসে এসে ভিন্ন গঠনের মানবগোষ্ঠীতে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিল, তার ছায়া, ঋষির কল্পনার উর্বশী সহস্রার নিভৃত কন্দরে আলোক স্তম্ভের মত আজও একই রকম দীপ্তিময়ী।

বিশ্বজননীকে পরমপিতার আশীর্বচন যুগযুগান্ত, কালাতিকাল ধরে মূর্ত হয়ে আছে। সেই নিরাকার 'বাক্'; নানা কালে নানা ভাবে সূক্তে, উপাখ্যানে, নাটকে, কাব্যে তাকে বিশ্বাসযোগ্য ধ্যানধারণার কাঠামোর মধ্যে বাঁধবার প্রয়াস হয়েছে। সেই কোন্ কালে কামদেব যেমন কায়াহীন হয়ে সর্বজীবে অবস্থান করছে, উর্বশী সেই একই সত্তা। এ কারণে সে জন্মরহিতা, বন্ধ্যা, অনন্তযৌবনা, অবন্ধনা, বন্দনীয়া, বধিরা, নিষ্ঠুরা। তার একমাত্র পরিচয় অনির্বান যৌবন বহ্নিশিখা। যৌবন দেহে বিকশিত হলেই হয় তুমি উর্বশীকে চাইবে, নয়ত নিজেই উর্বশী হয়ে উঠবে।

তালভঙ্গ হল উচ্চকিত হাসিতে। উর্বশীর নয়, আমার উর্বশী চিন্তায়। কেশিদৈত্য কর্তৃক অপহৃতা চিত্রলেখা ও উর্বশীর আর্তনাদ মহাকবি কালিদাসের সূত্রধারের চিন্তার ছেদ ঘটিয়েছিল, তার মনে হয়েছিল বাণবিদ্ধ উৎক্রোশীর আর্তস্বর। তারপরই সূত্রধারের প্রস্থান। কেশিদৈত্যের কবল হতে দু'টি স্ত্রীরত্নকে উদ্ধার করে পুরূরবা উল্লাস হাস্যে গগনমণ্ডলকে ঝংকৃত করেছিল কিনা এতথ্য জানানোর সুযোগ সূত্রধারকে দেওয়া হয়নি।

কিন্তু এক্ষেত্রে, আমার বাস্তব জীবনের এই মুহূর্তের সঙ্গী পত্রকারের হাসি নিঃসন্দেহে তালভঙ্গ করল। অন্তরমনের সঙ্গে

এমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম যে তাৎক্ষণিক স্মরণ করতে পারলাম না তালভঙ্গের ঠিক পূর্বমুহূর্তে একালের উর্বশীর সামনে বসে কি ঘটেছিল। তবে সম্বিৎ ফিরে বুঝলাম হাসির উপলক্ষ্য আমিই।

চিন্তার এত গভীরে ডুবে গিয়েছিলাম যে বাহ্যেন্দ্রিয়ে চোখ দু'টি অনেকক্ষণ স্থির হয়ে ছিল বাচ্চুদির মুখের উপর। উপস্থিত বাকি তিনজনের নজর সেদিকে পড়তেই বাচ্চুদি নরম সুরে ঠোঁটের কোণে হাসির রেশ ছুঁয়ে বাঁকা ভ্রু জোড়া নাচিয়ে চোখের ভাষায় প্রশ্ন তুলেছিলেন—এই কি সেই পুরূরবা ?

ঘটনা অনুধাবন করে লজ্জা ঢাকতে কালিদাসের উর্বশীর মত আমার ত তিরস্করিণী-বিদ্যা জানা নাই; ফলে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধূম্রজালের আবরণ টেনে দিলাম নিজের দৃষ্টিপথের সামনে; চোখে জ্বালা ধরার অজুহাতে চোখ বুঁজলাম।

এই এক আপদ। বাইরের দৃষ্টি আবৃত হলেই অন্তর্দৃষ্টি বেশী সজাগ হয়ে ওঠে। মন করে ছটফট, কি যেন খোঁজে। সাগরবেলায় ঝিনুক কুড়াতে কুড়াতে আনমনে মানুষ যেমন হারিয়ে যায় চোরাবালিতে, তেমনি যে যা বলে বলুক আর যা ভাবে ভাবুক আমি আবার খুঁজতে প্রয়াসী হই উর্বশীকে। মনের গভীরে ডুব দিলেই দ্বিতীয় সত্তা সরব হয়ে উঠে।

নারায়ণ-কন্যা উর্বশীকে ত দেখেছি। এবার যেতে হবে গন্ধর্বনগরে।

স্থিরযৌবনা উর্বশীকে যেমন পুরাণকার ইন্দ্রসভার সুরসুন্দরী বলেও শেষে স্বর্গবেশ্যা হিসাবে অভিহিত করে আপন মনের লালসার ব্যর্থ আক্রোশ মিটিয়েছেন, তেমনি অপ্সরাদের সঙ্গে যোগসাধন ঘটিয়েছেন গন্ধর্বদের। অপ্সরাদের সাধারণ নটির স্তরে নামিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে নটদের প্রয়োজন দেখা দেওয়ার গন্ধর্বদের উদ্ভব। এরা স্বর্গের নট। অপ্সরারা ষোড়শকলায় নিপুনা, গন্ধর্বরাও সঙ্গীত-নৃত্য কুশলী। গন্ধর্বদের রাজার নাম চিত্ররথ।

এখানে আরেক কাহিনী। এই কাহিনীর উর্বশীরও প্রথম সাক্ষাৎ মেলে ঋক্‌বেদে। সেখানে তিনি বাক্‌ নামে উল্লিখিতা। গন্ধর্বদের সঙ্গে থাকতেন। দেবতারা কৌশলে তাকে স্বর্গে নিয়ে আসেন। বেদের এই গন্ধর্ব কিন্তু আদৌ নট ছিল না। গন্ধর্ব নট হয়েছে পুরাণকারের লেখনীতে পরবর্তীকালে।

এই সূক্তের ভিত্তিতে উর্বশীর সঙ্গে গন্ধর্বর যেমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনি নতুন কাহিনীরও সাক্ষাৎ মেলে পুরাণে।

সেই পুরাতন ও চিরনতুন কাহিনী পুরূরবাকে ইন্দ্রসভায় দেখে বিমোহিতা উর্বশীর নৃত্যে তালভঙ্গ। ফলে যা হয়, অভিশপ্ত হয়ে মর্তবাসী পুরূরবাকে সঙ্গদান। সেখানেও তিন সর্ত খেলাপ হলেই বিলাপ। ওদিকে কিছুকাল মধ্যে উর্বশী-বিহনে ইন্দ্রসভা অন্ধকার। ফিরিয়ে আনতে হবে নটী বিনোদিনীকে। অতএব ষড়যন্ত্র করো। গন্ধর্বরা আসরে নামল। স্বর্গের নটীকে স্বর্গে ফেরৎ পাঠিয়ে পুরাণকার দেবগণের মুখরক্ষা করলেন।

বড়ই অদ্ভুত কথা এবং বেশ রসাল। কাহিনীটি অশ্লীলতার দায়ে পড়ে। প্রশ্ন হল, এতক্ষণ ত উর্বশীর একটা নৈসর্গিক সত্তা পাওয়া যাচ্ছিল। এখন পুরূরবার সংস্পর্শে এনে উর্বশীকে একেবারে নটী সাজনো হল কেন?

ধন্য ঋষিগণ! কল্পনার বাহাদুরীতে কেউ কম যেতে চায় না। উর্বশী-প্রেমে সকলেই অসংলগ্ন জিহ্বা। স্থিরযৌবনা উর্বশীর তারকাখচিতদেহে লগ্ন হয়ে একটি নতুন তারার মত সকলেই অমরত্বের কামনায় নিত্য নতুন কাহিনী সৃষ্টি করে বিংশ শতাব্দীর অবিশ্বাসী মানুষের মনে শুধু উপহাসের পাত্র হয়েছেন। জানি না তারকা হয়ে আপনারা পৃথিবীর পানে আজও চেয়ে আছেন কিনা; যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আজকের আমাদের এই মানসিকতা কি আপনারা অনুভব করে লজ্জায় অধোবদন? অথবা আমাদের ধ্যানের দৈন্যতায় উপহাসের কারণে মিটিমিটি চাহনি?

শেষেরটাই ঠিক মনে করি। আকাশের তারাগুলো আমরা বলি জ্বলছে আর নিভছে। ওরা ভীমকায়, সূর্যের মত, এমন কি তার চেয়েও বড় এবং ভয়ংকরভাবে তাপ ও আলো বিকীরণ করছে। দূরত্ব হেতু আমাদের ঝাপসা দৃষ্টিতে আমরা ভুল বুঝছি, অন্ধের হস্তীদর্শনের মত।

এই লজ্জার হাত হতে আমাদের বাঁচিয়েছেন পণ্ডিত যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তিনি নানা যুক্তি তর্ক উদাহরণ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন গন্ধর্বনগর ব্যোমমণ্ডলে ধ্রুবতারা অভিমুখে একটি নৈসর্গিক ঘটনা। অতএব আকাশের তারার জগতেই গন্ধর্বনগর। সোজাকথা গন্ধর্বরা আকাশের। গন্ধর্বরাজের নাম চিত্ররথ অর্থাৎ বিচিত্রদেহী। কে এই চিত্ররথ ?

ব্যোমমণ্ডলের মেরুতেজের সিদ্ধান্তোক্ত নাম গন্ধর্বনগর। সূর্যরশ্মির প্রতিফলনে পৃথিবীর উত্তরমেরুর ঊর্ধ্বাকাশে দৃষ্ট বিচিত্রবর্ণ সুষমামণ্ডিত পরিবেশের নাম গন্ধর্বনগর। বিচিত্র এই মণ্ডলের কার্যকারকের নামই চিত্ররথ ; অর্থাৎ সূর্য।

ঘুরে ফিরে একই নৈসর্গিক ব্যাপার ; শুধু দেখা আর বর্ণনার হেরফের। এ যেন একই অঙ্গ শতরূপে আলেখ্যবদ্ধ।

এখন আমি সজাগ। দ্বিতীয় সত্তার ভুলভুলাইয়ার ফাঁদে সহজে পা দিচ্ছি না। সেও চুপ, দম নিচ্ছে হয়ত। পত্রকারের কাছে বোকা বানিয়েছো আমাকে, এবার তুমি বোকা বনে বক্‌বকম থামাও। বরং আমি তোমায় বাচ্চুদির গল্প নয়, সত্য কথা শোনাই।

প্লেট ভর্তি খাবার এসেছে। শুধু আসবাব গৃহসজ্জায় নয়, খাদ্যের খোশবুতেও বৈভব মালুম হচ্ছে। মধ্যবিত্তের রসনা অনেক পদের সঙ্গে অপরিচিত। এক্ষেত্রেও অগতির গতি আমার কাণ্ডারী। তার হরেক স্থানে আনাগোনা, কায়দায় চোস্ত। অতএব মুখ নামিয়ে ট্যারা চোখে তাকে অনুসরণ।

সাগরপারের কায়দা ; ভোজসভার আয়োজন ছাড়া বাক্যালাপ নাকি জমে না। কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে পত্রকার আর বাচ্চুদি। আমার রসনা নতুন স্বাদে বাক্‌হীন। তবে শ্রবণেন্দ্রিয় এখন ঠিকমত কাজ করছে।

বাচ্চুদির বাবা চাকুরি সুবাদে তখন বর্ধমানে। ওরা পাঁচ বোন, দুই ভাই। বড় সংসার, মধ্যবিত্ত পরিবার। তিন কুঠরী ভাড়াবাড়ীতে বসতি। বাচ্চুদি সবে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। একদিন পাড়ায় সাড়া জাগলো পাল্‌লা রোডের ডাকবাংলায় দামোদরের ধারে কি একটা বইএর শুটিং হচ্ছে। সিনেমা দেখে বহুজনে, কিন্তু ছবিতোলার পদ্ধতির সঙ্গে খুব অল্পজনের পরিচয়। তাই কৌতুহল প্রবল। লোকের বাঁধ ভেঙ্গেছে। ওদের পাড়ার ছেলেরাও চটজলদি চাঁদা তুলে ট্রাক ভাড়া করেছে। মেয়েবুড়োরাও সঙ্গ ধরল। বাচ্চুদিও ভিড়েছিল ওদের সঙ্গে। গিয়ে দেখল কোথায় কি। শুধু লোকের মাথা, যেন কোন সভা। হাজার মৌচাক ভাঙ্গা মৌমাছির গুঞ্জণ বুঝি বা সোচ্চার হওয়ার জন্য থমথমে। যে কোন মুহূর্তে হয়ত আওয়াজ তুলবে,—ধাপ্‌পা দেওয়া চলবে না। কালো হাত ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

যাদের কাজে নামার কথা তারা এদিকওদিক ছড়িয়ে, মুখে একটা হতাশার ভাব নিয়ে। তবু তাদের দেখতে চিনতে হুড়োহুড়ি। বাচ্চুদিও সেই গুঁতোগুঁতির ঠেলায় গেট টপকে হঠাৎ ভিতর আঙ্গিনায়। বেতের চেয়ারে বসে মাথায় সাদা টুপি এক ভদ্রলোক আনমনে চুরুট টানছিল। তার সঙ্গেই চোখাচোখি। বাচ্চুদি ভয়ে সংকোচে পিছন ঘুরেছিল, ঠিক তখনই গম্ভীর কণ্ঠে ডাক,—শোন।

বাচ্চুদি এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ বাচ্চুদিকে মাপজোপ করে বললেন,—তুমি অভিনয় করতে পারো ?

স্কুল কলেজে এক আধটু করেছি।

দেখিয়ে দিলে পারবে ?

বাচ্চুদির হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠেছিল, তার মন জানিয়ে দিল সামনে আলো। নিঃসঙ্কোচে বলল,—পারব।

ভদ্রলোক তাকে পাশের চেয়ারে বসতে বলে হাঁক দিলেন,—হাবুল বাবু।

উদাসী এক প্রৌঢ় হাজির হতেই বললেন,—দেখুন ত আপনি। আমার ত মনে হয় ডামি করা যাবে।

প্রৌঢ়র উদাস চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা। উঠে দাঁড়াও, পাশ ফেরো, হাঁটো, ঝুঁকে মাটি হতে একটা জিনিষ তোলার ভঙ্গি করো, হাসো, বিমর্ষ হও, আরও হরেক রকম। প্রায় আধঘন্টা এমনতরোর পর প্রৌঢ় রায় দিলেন,—চলবে।

ভদ্রলোক বললেন—তুমি সিনেমায় নামবে?

এই অযাচিত প্রস্তাবে, যদিও অভিনেত্রী হওয়ার কোন স্বপ্ন সে দেখেনি, রাজী হয়ে গেল।

ভদ্রলোক একজনকে ডেকে কি সব নির্দেশ দিলেন। তারপর বাচ্চুদির কাছে তার পরিবারের পরিচয়, দৃষ্টিভঙ্গি, পড়াশুনা সব জেনে শেষে বললেন,—আমি এখনই তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নোব। যদি উত্‌রাতে পারো তাহলে কাজের শেষে তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার বাবার সম্মতি নোব।

দলের মধ্যে সাজ সাজ রব, বাইরের ভীড়েও সংবাদটা ছড়িয়ে গেল। বাচ্চুদির পাড়ার ছেলেদের সে কি উল্লাস,—বাচ্চু! জান দিয়ে লড়ে যা।

তা সে লড়েছিল। পড়ন্ত বেলায় পাড়ার লোকেরা ফিরল ট্রাকে, আর বাচ্চুদি তার দুই পাড়াতুতো দাদার সঙ্গে পরিচালকের গাড়ীতে।

বাড়ীতে আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয়নি। বাচ্চুদির বাড়ীর লোকে খবরটা আগেই শুনেছিল, এখন শুধু ভাঁড়ামীর পালা। ঠিক

হল আজকের এক্সপোজের ডেভেলপ করে যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে পরের সপ্তাহে এসে পাকা চুক্তি।

এক একজনের ভাগ্য এমনিভাবেই খুলে যায় আচম্কা। বাচ্চুদিরও তাই। ভাগ্যি সেদিন সহ-নায়িকার ভূমিকায় নির্ধারিত শিল্পী অনুপস্থিত ছিল।

উত্তরণের সেই সূত্রপাত। হয়ত তার ভিতরে একটা শিল্পী-সত্তা ঘুমিয়েছিল, সুযোগ পেয়ে জেগে উঠেছে।

প্রথম ছবিতেই নাম কুড়িয়েছিল। পরিচালকের পরিশ্রম আর তালিম ছিল পিছনে। বাচ্চুদিও কোন ব্যাপারে দ্বিধা করেনি, একাগ্রতায় ডুব দিয়েছিল।

বাড়ীর লোক, পাড়ার সবাই ডাকত 'বাচ্চু' বলে, স্কুল-কলেজের খাতায় আর অল্প পরিচিত মহলের নাম—প্রতিভা সিংহ রুপালী পর্দায় হয়ে গেল পদ্মিনী, পদ্মিনী সিন্‌হা।

জলখাবারের পাট চুকতেই বেয়ারা প্লেট তুলে নিয়ে গেল। তারপর ট্রেতে যা সাজিয়ে নিয়ে এসে সামনে নামিয়ে দিল তা দেখে ছাপোষা গেরস্ত এই অধমের চক্ষু স্থির। বুঝিবা হৃৎপিণ্ডের রক্ত-স্পন্দন ক্ষণিক স্তম্ভিত। ঠিক তখনই সহস্রার মণিকোঠায় দ্বিতীয় সত্তাটি সাড়া দিল,—তুমি উর্বশী দর্শনে এসে সোমরসে চমকাচ্ছ? ঐ যে ইন্দ্রসভায় স্বর্বেশ্যা নটী উর্বশী নাচত তার কি সাধ্য ছিল নিজেকে রসিয়ে না নিয়ে লাস্যনৃত্যের তাল ঠিক রাখা। আর সমঝদাররা কেউ একশিরা, কেউ চতুরানন ইত্যাদি তারা কেউ বায়ুভুখ দেবতা ছিলেন না; আকণ্ঠ সোমরস পান করে ঢুলুঢুলু নেত্রে অপরূপা নিরাবরণা দেহবল্লরীর ছন্দহিল্লে'ল উপভোগ করতেন।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম তাকে। বাস্তবে জানান দিলাম চতুর্থ গ্লাসটি বাদ দিতে।

পদ্মিনীর মুখচোখ বিস্ময়ে রক্তিম, যেন পায়ের বদলে হাতে ভর দিয়ে একটা মানুষ তার সামনে উল্টোমুখো চলেছে।

চোখ ঘুরল তার পত্রকারের মুখে। তিনি আশ্বস্ত করলেন,—ছাড়ুন ত বাচ্চুদি; ওসব কাঠঠোক্‌রা রসের বোঝে কি, অথচ রস-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কলম ঘষছে। কত বলি ওকে লাইনে নামো, তবে ত আসল লাইন ধরতে পারবে। ফুঃ।

ওর ফুৎকারে আমার সদ্য জ্বালানো দিশলাই কাঠিট. নিভে গেল। ওদের হাতে তুলে ধরা তিনটি গ্লাস মাথা ঠোকাঠুকি করে স্বাস্থ্য কামনা করল; বলা বাহুল্য আমার বত্রিশ ইঞ্চির ছাতিওয়ালা বুকের খাঁচার কথা মনেই পড়ল না তাদের।

ওদের প্রথম ওভার শেষ। আলু ভাজা আর কাজু বাদাম দাঁতে পিষছে। পত্রকার দম নিয়ে বলল,—আচ্ছা বাচ্চুদি. আপনার কোন্ বই প্রথম বক্‌স অফিস হিট করেছিল।

অধঃপতন।

পত্রকার এমন অট্টহাস্যে ভেঙ্গে পড়ল যে আমার কথা থাক, সারমেয় দুটি পর্যন্ত চমকে রব তুলে পদ্মিনীর কোলে। লাসা এপ্‌সো ত আঁচল খসিয়ে আঁচড়ে চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে একেবারে কাঁধে চাপল। পদ্মিনীর ঠোঁটে বরাভয়মুদ্রা। দুহাতে লাসা এপ্‌সোকে শূন্যে তুলে তার নাকের ডগায় সশব্দে চুমু খেয়ে বলল,—নটি।

একাক্ষির ক্যামেরায় আলোর ঝিলিক।

লাসা এপ্‌সোকে নামিয়ে দিল মেঝেতে। ভুল বুঝে স্প্যানিয়েলও স্থান ত্যাগ করল। হাসির দাপটে পত্রকারের ভুঁড়ি তখনও কাঁপছে। বিড়বিড় করছে.—দারুণ! দারুণ!

মাথা হেঁট করে বোতলের উদ্দামতা গ্লাসে ঢালছে। মুহূর্তের নৈঃশব্দের মাঝে কলসী হতে জল গড়ানোর ঢুক্‌ঢুক্ শব্দ, রাগী বিড়ালের গোঙানীর মত সোডার বোতল খোলার ফ্যাস্‌ফ্যাস্।

হাতের গ্লাসটা পদ্মিনীকে তুলে দিয়ে বলল,—এখন আপনি উর্বশী। এবার যে বই হাতে নেবেন তার নাম দিতে বলবেন,—উত্তরণ।

ঠোঁটে উঠছিল গ্লাসটা, সরে গেল ; হাসি উগরে জবাব এল,—ফাইন। এমন নামে একটা গল্প লিখে ফেলুন ত চটপট।

ও আমার কম্ম নয়, বরং ইনি—

কথা শেষ না করে বক্তা তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমার দিকে হেলিয়ে দিল। পদ্মিনীর নজর পড়ল আমার উপর অনেকক্ষণ পরে।

বলল,—আপনাকে লাইম জীন দিতে বলি।

ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানালাম।

তাচ্ছিল্যে হেসে বলল,—ওটা ত টুস্‌কি মেয়েদের ড্রিঙ্কস্। নেশাই হয় না।

হেসে উত্তর দিলাম,—ঐ জন্যই খাবো না।

এবার পদ্মিনীর পালা। 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' গানের কলির অঙ্গছন্দ। সঙ্গে সংলাপ,—রসবোধ যখন আছে তখন দয়া করে অর্জুনের মত জননী সম্বোধনে আমাকে বিব্রত করবেন না নিশ্চয়ই। ওটা বীর ছিল, না ছাই, স্রেফ গর্দভ।

আরেক দফা হাসির দমকে ওদের দ্বিতীয় ওভার শেষ। হাতের খালি গ্লাস নামিয়ে পদ্মিনী ডানহাতের তর্জনী দিয়ে অধরোষ্ঠে আড়াআড়িভাবে চাপ দিল। বুঝলাম ভিজেভাবটুকু শুষে নিল। দেখলাম অধর-রঞ্জনীর কোন বিকার ঘটল না। গালের মাঝে ফুটে উঠেছে রক্তিম আভা প্রসাধনী ভেদ করে। চোখের পাতা কমল-কোরকের মত আধোফোটা। যেন অনেকদূর হতে সাড়া জাগল,—লিখে নিন, ছেপে দেবেন আমার নাম দিয়ে। পত্রকার লিখল,—বিয়ে করে ছেলেমেয়ে নিয়ে যারা সংসার করে, তারা অহরহ অভিনয় করে চলে। কিন্তু অভিনয় যাদের পেশা, তাদের সংসার করা উচিত নয়, বিয়ে করা, ছেলেমেয়ের মা বা বাবা হওয়া অন্যায়।

কলমচি কলম থামিয়ে মুখ খুলল—কেন ? অনেকেই ত করে।

পদ্মিনীর সুস্পষ্ট জবাব,—ওদের আমি করুণা করি। অনেক

খবর ত রাখেন আপনারা। ওদের ঘর সংসারের সচিত্র প্রতিবেদন ছাপেন, কিন্তু ভিতরে ঢুকে আসল রূপ দেখেছেন কি?

একটু থেমে বলল,—হয়ত দেখেছেন, দেখে চেপে যান; কারণ ফ্যানরা ওসব নেবে না। তাদের কৌতূহল অমুক তমুকের সঙ্গে জড়াচ্ছে, এখানেই শেষ। কাগজের চাহিদা এমন সংবাদের কমবেশীর উপর বাড়ে কমে। ঠিক কিনা?

আপনার নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা হতে একথা বলছেন? শুনেছিলাম আপনি নাকি —

পদ্মিনী হাত তুলে নিরস্ত করল,—এটাই কি আপনার শেষ প্রশ্ন?

পত্রকার বোতল উপুড় করতে যাচ্ছিল, শঙ্কিতভাবে বলল,—না না। এখনও ত অনেক কিছু শোনা বাকি।

পদ্মিনী মনোযোগ দিল বোতলে। ভর্তি গ্লাসটা চোখের সামনে ধরে বলল,—আপনি উত্তরণের কথা বলছিলেন। অধঃপতন হতেই তার শুরু হয়েছে, আজ ত পরিপূর্ণতা। ঐ ছবিটা দাঁড়িয়ে যেতেই আমার দাম বাড়ল, চাহিদা হল। আগে পরিচালক আর প্রযোজকের দরজায় ঘুরেছি, এবার তারা আমার দরজায় ভীড় করল। তখনও আমার 'বাচ্চু' নাম মুছে যায়নি, কোলকাতার সাময়িক বাসার মধ্যবিত্ত পরিবেশ ঘোচেনি। পরিশ্রম আর অনিয়মের সামঞ্জস্য রেখে আহার বিশ্রাম জুটত না। কিন্তু আমার জেদ চেপেছিল। নেমেছি যখন শেষ দেখব। বানভাসির মত হয় তলিয়ে যাবো, নয়ত তীরে উঠব। এই সময়ই সুযোগ এলো 'অধঃপতন' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের। কিছু কিছু দৃশ্যে আমার আপত্তি ছিল, আউট ডোরে কারও কারও আচরণে বিবেক দংশন হচ্ছিল, কারণ তখনও সংস্কারের বাঁধাধরা গণ্ডীটা পেরিয়ে আসতে পারছিলাম না। আবাল্যপালিত সংস্কার আর রূঢ় বাস্তবের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম।

পত্রকার গ্লাস ভরে দিচ্ছে, তুলে দিচ্ছে হাতে। আমি পদ্মিনীর সংলাপে বিস্ময়বিমূঢ়। রূপালী পর্দায় তার বহু অভিব্যক্তি দেখেছি; কিন্তু হাতের নাগালের মধ্যে একেবারে রক্তমাংসের পদ্মিনীর সামনে এই প্রথম। মনে হ'চ্ছিল ইন্দ্রসভার পাদপ্রদীপ জ্বালানোর পূর্ব-মুহূর্তে হয়ত ভরতমুনি এমনিভাবেই উর্বশীকে তালিম দিতেন তাল, লয়, মুদ্রা, সংলাপ প্রক্ষেপণ, অঙ্গ সংস্থাপন, ভাবপ্রকাশ।

ওদের এখন চার ওভার চলছে। কেউ আউট হয় নি। ভাষণে, কর্মতৎপরতায়, আচরণে কারও কোন জড়তা বা অনাচার নাই। লাসা এপ্‌সো আবার পদ্মিনীর, তার কর্ত্রীর বুকে। তাকে বুকে চেপে নরম লোমের মধ্যে আঙ্গুল নাড়তে নাড়তে পদ্মিনী আবার মুখরা হল।

'অধঃপতন' হিট করার সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরিবর্তন শুরু হল। হতেই হবে; পদ্মিনীর আবির্ভাব ঘটেছে। পথে বের হলেই স্তাবকে ভীড় করে, তিক্তমধুর মন্তব্য কানে আসে। পরিবেশ পাল্‌টাতে হল, নিজেও বদলে গেলাম। এতদিন যারা ছিল আপনজন, তারা কেউ নিজেরাই সরে গেল, বাকিদের আমাকেই সরাতে হল। বাচ্চু আর পদ্মিনী এক নয়। নতুন মুখের ভীড় জমল। কাজ বাড়ল। পাবলিক চায়, পদ্মিনীর সময় আছে কি নেই সে কথা ভাববার দরকার নেই তাদের। প্রযোজক ডেট ধরে রাখার জন্য পিছনে লেগে থাকে, নইলে তার অর্থ অপচয়, বই রিলিজ হওয়ার বিপত্তি। সকাল হতে রাত দুপুর পর্যন্ত এ-ফ্লোর হতে ও-ফ্লোর ছোটাছুটি। মেকআপ করো আর তোল। ক্লান্তি আসে, তবু ছাড়ে না কেউ, উত্তেজক আরক গলায় ঢেলে চাঙ্গা হতে হয়। পরের দিনের কাজের ভাবনায় ঘুম আসে না চোখে সহজ পথে; ঘুমের ওষুধ সঞ্জীবনী। সকালে নেশার ঘুম ভাঙ্গে পরিচারিকার অঙ্গসংবাহনে। বিত্ত বৈভব জনপ্রিয়তা আমাকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। আমি নিছক একটা পণ্যা, ভোগ্যা।

কথা বলার ধরণে কেমন যেন দোলা লাগে। মনে হয় পত্রকারের

বাচ্চুদির বুঝিবা নেশার ঘোর লেগেছে। অথচ তন্দ্রালু চোখের মগ্নতা ছাপিয়ে বিষণ্ণতার কালো মেঘ। এ যেন অন্য রূপ, উচ্ছল নাটকের পট পরিবর্তন। বলা যায় মানসিকতার রূপান্তর; চলতি কথায় ইংরাজীতে যাকে বলে 'মুড'।

পত্রকারের পোড় খাওয়া ঝানু চোখেও ছায়া পড়ে। মুড যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সব মাটি। তখন দৃঢ়স্বরের ছোট্ট একটি শব্দ মাত্র—থ্যাঙ্ক উ।

ব্যাস! বিড়ালের গায়ে জল পড়া অবস্থা। হতবাক্ চোখে শুধু উর্বশীর পর্দার অন্তরালে অন্তর্ধানের দৃশ্য অবলোকন।

অতএব সুযোগ নষ্ট না করে পত্রকার অবস্থা সামাল দিল,—বাচ্চুদি. এবার অনুমতি করুন। ঘরোয়া পরিবেশে—

যাক্ মেঘ কেটে গেল। আগের মত হাসি বিগ্নিয়ে কথা শেষ করতে না দিয়ে অভয় দিলেন,—বেশ ত ভিতরে চলুন।

ওরা তিনজনে উঠে পড়ল। আমারও ডাক পড়েছিল; এড়িয়ে গেলাম। আমার মাথায় তখন 'পণ্যা' শব্দটি ঘুণপোকার মত কুরকুর করে কাটছে। কথাটা ফেলবার নয়; কিন্তু অবস্থাটাও ত দু'এক হাজার বছরে হয়নি। অতএব দ্বিতীয় সত্তা সজাগ হয়ে ওঠে। মনের চোখ ঘোরে পিছনে, খুঁজে ফেরে সেই কৃষ্ণবরণা উদ্‌বিড়ালীকে। হারিয়ে যাওয়া অতীতের ঘোর আঁধারে অন্বেষণ। বিবর্তনের ক্রম অনুসরণে সম্ভাবনার রূপরেখার আঁচড় টানা।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। যেন অমৃত। চিন্তু'র লাটাই-এ ঘুরপাক খাওয়ার সময় চা কফি তাম্রকুট সত্যই অমৃত। জমিয়ে সুতোর টানা পোড়েন করা যায়। আমি জমে গেলাম।

খ্যাপা খুঁজে ফেরে। অতীতের গাঢ় নৈঃশব্দের গহনে সেই আদিমতম যুগের হারিয়ে যাওয়া উদ্‌বিড়ালীকে আর কি পাওয়া যাবে না?

কত প্রজন্ম কেটে গেল তারপর ; আজকের হিসাবে হয়ত দশ বিশ হাজার বছর। সাদায় কালোয়, দলিত আর উন্নত নাসায়, দীর্ঘদেহী ও খর্বকায়ায় লম্ব এবং কুঞ্চিত কেশীতে নানাভাবে, বহু বিপর্যয়ে মিলেমিশে প্রজাপতির শতেক প্রজাতির মত আদিম মানবও ইতিমধ্যে নানা গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত। যার খুশী সে জেনে নিতে পারে এসব তথ্য নৃতত্ত্বের নামী দামী ভারি কেতাব উল্টে। আমার ওতে স্পৃহা নাই, আমার মন খোঁজে শুধু তাকে, যে প্রথম মানুষের মনে অপ্সরার স্বপ্ন গেঁথে দিয়েছিল।

এমন সময়। তাম্রকূটের ধূম্রজালের আড়ালে দেখতে পাই তাকে। প্রায় একই রকম। শতাধিক লোকের রাত্রিবাসের উপযোগী হাজারো ঝুড়ি নামানো বটবৃক্ষতলে অলস ভঙ্গিতে। গ্রীষ্মের শেষ লগ্নে অস্তাচলে ধ্যানস্থ অরুণের বিদায়ী রশ্মি তার ঘর্মাক্ত দেহে বিকিরিত। হঠাৎ সে চমকিত হল। তীক্ষ্ণ হল চাহনি। স্থির নিশ্চয় হল দূরের তৃণভূমি পেরিয়ে একপাল মেষ হ্রদে নামছে জলপান করতে। হিস্‌হিস্‌ শব্দে দলের সকলের নজর টানলো। কি যে খেয়াল হল, হুকুম দিল হত্যা করে নয় জ্যান্ত ধরে আনতে ওগুলোকে। নেত্রীর আদেশ। শ্বাপদ সতর্কতায় নিমেষে তারা বন্দী করল গোটা বিশেক ; ব'কিগুলো পালিয়ে বাঁচল। অস্ত্রধারণে নিষেধ না থাকলে ওগুলোও আয়ত্বে আসত। কদিন নিশ্চিন্তে এখানেই কাটানো যেত। তবু আশা ছিল আজ শুধু ফল ভোজন নয়, আমিষও জুটবে। শুকনো ডালপাতাও জোগাড় করে ফেলেছিল। কিন্তু কি যে হল সেদিন নেত্রীর। লতার বাঁধনে ছোট বড় মেষগুলো চকিতে ঘটে যাওয়া অঘটনে বিমূঢ়। শিং নাড়তে, বব তুলতে ভুলে গিয়েছে। অসহায় করুণ চোখে চেয়ে আছে শুধু। সেই মায়াবী চোখে চোখ রেখে নেত্রীর যেন বিভ্রম ঘটল, হিংস্রতার ক্ষুরধার ভোঁতা হয়ে গেল। অঘটন সর্বকালেই ঘটে। আর অঘটনের মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় নিত্য নতুন উপলব্ধি। ওর আজ সব কেমন উলোটপালট হয়ে গেল।

রাত্রি নামে। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন। ওরা উঠে গেল গাছের উঁচু ডালে। মেষগুলোকেও সঙ্গে তুলতে ভুলল না। নেত্রী একটা বাঁকানো মোটা শাখার খাঁজে আয়েজ করে বসল পা ছড়িয়ে। কোলে তুলে নিল ছোট একটা মেষশাবক। সে নিজের বয়সের হিসাব জানে না, জানার জ্ঞানের উন্মেষ তখনও ত হয়নি। তবে এটুকু বোধ রয়েছে যে নেত্রীত্ব রক্ষা করার সামর্থ এখনও তার অটুট। কিন্তু সে এখনও সন্তানহীনা। প্রাণজগতে স্ত্রীজাতির মাতৃত্বের বিকাশের সঙ্গে আচরণের পরিবর্তন সকল প্রাণীর মধ্যেই ঘটে; একটু লক্ষ্য করলেই তা সহজে চোখে পড়ে। বাঘিনীর কোল হতে তার বাচ্চা হরণ করা যেমন দুরূহ, তেমনি উড়তে না শেখা চড়ুই পাখীর ছানা বাসা হতে পা ফস্কে নীচে পড়ে গেলে মা-চড়ুই এর অসহায় আর্তনাদ একই পর্যায়ের। আদিম মানবীও এই জৈবিক আকর্ষণের ব্যতিক্রম ছিল না।

মেষশাবকটির তুলোর মত নরম গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে সে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠল। শাবকের মুখটা চেপে ধরল তার বন্ধ্যা আনম্র স্তনে; গুঁজে দিল স্তণবৃন্ত কচি দাঁতের ফাঁকে। মোহাচ্ছন্ন; হয়ত বা তন্দ্রা।

আচমকা ঘোর কেটে গেল কাঁধের উপর পুরুষ স্পর্শে। চোখের সামনে কাঁচা বা ঝল্সানো মাংস চিবানো দুপাটি ধবল দাঁতের বিকৃত প্রকাশ। অনীহা। এক নতুন অনুভূতি হতে ভিন্ন সহজাত দেহ-বাঁধনে জড়ানোর অনীহা। সমস্ত শক্তিকে মুষ্টিবদ্ধ করে বাম হাতে শাবকটিকে চেপে ধরে ডান হাত ছুঁড়ে দিল। শাখা প্রশাখায় ঝুপঝাপ ভারি বস্তুর পতনের শব্দ। বিকশিত দন্তপাটি মিলিয়ে গেল, কাঁধে শুধু তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়। পানা ভরা জলে ঢিল পড়ার মতই ক্ষণিকের এই ঝটাপটি নিস্তব্ধতায় মুক হয়ে গেল। আদিম মানব জীবনে এ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কে এলো বা গেল তার পূর্বাপর কোন ছাপ রাখে না। বন্ধন মেনে চলে আত্মরক্ষার কারণে,

সহজাত প্রবৃত্তিতে; তাই বলে কেউ কারও দাস বা দাসী নয়। স্বাধীনতায় স্ত্রী পুরুষের ভেদ নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় নেতৃত্ব মেনে চলে নারীর।

অথচ এই ত কিছুদিন আগে। ভর দুপুর বেলা। বনের মাঝে এক চিল্‌তে ফাঁকা উঠোনে রোদের আঁচ। নেত্রী একটা হেলে পড়া গাছে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে উঠোনের ওধারের গাছের তলায় এক শিম্পাঞ্জী দম্পতির আদরে খেলা দেখতে দেখতে নিজেও মেতে উঠল। এদিক ওদিক ছিটিয়ে ছড়িয়ে দলের অন্য সবাই। সে চোখ ঘুরিয়ে জরীপ করে একটি পুরুষের দিকে শীষ ছুঁড়ে দিল ইংগিতের। একসঙ্গে দু'জন এগিয়ে এলেও প্রথমজনকে সে সুযোগ দিল মিলিত হওয়ার সেই ভঙ্গীতেই দ্বিতীয়জনের উপস্থিতিতেই। অবশ্য তাকেও বঞ্চিত করেনি। প্রথমজনের ভূমিকা সাঙ্গ হওয়ার পর দ্বিতীয়কে নিয়ে সে উঠে গেল গাছে। সুবিধামত ডালে মুখোমুখী বসে নিবৃত্তি ঘটালো পরস্পরের লিপ্সা।

মন ঘুরে ঘুরে দেখছিল সুদূরতম প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব মানবীর লীলাক্ষেত্র। চকিতে ফিরে এলো বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। আমি তখন বাঁকুড়ায়। জেলার দক্ষিণের বনাঞ্চল আর সেই পরিবেশের কালো-পাথরের খোদাই মূর্তির মত আট-সাঁট ভরপুর যুবক যুবতীর রূপে আমি মজে গিয়েছিলাম। সে সময় একজন লেখাপড়া জানা সমবয়সী আদিবাসী বন্ধু জুটেছিল। অনেক কথা হোত ওদের জীবনযাত্রা নিয়ে। মনের কথাও ঘোরপ্যাঁচে বলেছিলাম। একটা সুর বাজতো তখন অহরহ,—বন্যেরা বনে সুন্দর, যুবতীরা শাল-পলাশ-মহুয়ার বনে।

একবার নিয়ে গেল সে ওদের গ্রামে। অনেক দূরের পথ। বাঁকুড়া হতে ঝিলিমিলি; গোনাগুনতি বাস। ওতে চেপে রাণীবাঁধ পেরিয়ে বাস ছেড়ে পথে দুধারে পাহাড়ী বন। পথ আছে কি নেই

বোঝা দায়। দুজনে পাকা সড়ক বামে রেখে জঙ্গলে ঢুকলাম। নির্বাক শালের সারি টপকে পায়ে হাঁটা ঢালু পথ। মাটির রং লাল। জানি না কোন্ রসের স্বাদ পেয়ে শালের কাণ্ডে একবুক উঁচু উই-এর বাসা। দিনের আলো গড়িয়ে পড়েছে। ঘরে ফেরা পাখীরা কলতান করে না-ফেরা সঙ্গীদের ঠিকানা জানান দিচ্ছে। হাঁটছি ত হাঁটছি। প্রায় নির্জন পথ। মাঝে মধ্যে দেখা হয় পথ চলতি আদিবাসী স্ত্রীপুরুষের। চলতে চলতেই ওদের মধ্যে কথা ছোঁড়াছুঁড়ি। যুবতীর সোচ্চার উচ্ছ্বাস। ভাষা বুঝি না, তাই আমি বোকা। বন্ধুর কাছে প্রশ্ন রেখে জবাব পাই ওরা জানতে চায় সঙ্গীটি কে। অতিথি জেনে তরল হাসির লহরীতে বলে নতুন মানুষটি আমায় দাও না। নেড়ে ঘেঁটে দেখি কেমন মুরোদ মরদের। পলিমাটির নরম দেশের মানুষ আমি ; আমার মুখেই চল্‌কে ওঠে রক্ত, ওদের হাসিতে সরল মনের ঠমক।

বন্ধু রসিকতা করল,—ইচ্ছা থাকলে একজনকে বেছে নিতে পারো।

ইচ্ছা ষোল আনা, ধোপদুরস্ত কেতাবী ভ'ণতায় সাহসের অভাব। বললাম,—আর কত দূর ?

জবাবের প্রয়োজন হল না। বাঁক ঘুরতে চোখের সামনে গ্রাম ধরা দিল। গ্রাম নয়, ছোটখাট একটা ডেরা। পনের বিশখানা একচালা ঘর। ঝকঝকে উঠোন, নিকানো দেওয়ালে খড়িমাটির অপটু হাতের শিল্পকাজ। এক ঝাঁক মুরগীর ছুটোছুটি, উদোম ছেলে-মেয়ের ভীড়। বসতিতে পথ বলে কিছু নেই ; বেসরম হওয়ার ভয় নেই যেখানে, সেখানে এর উঠোন ওর বাড়ীর বগল দিয়ে বন্ধুর বাড়ীর দাওয়া আদিম নিমের ছায়ায়।

ঘরে এলো যেন বন্ধু নয়, আমি। আমাকে ঘিরে মেয়ে মরদের ভীড়। কৌতুহলের শেষ নাই, প্রশ্নে প্রশ্নে বন্ধু জেরবার। খাটিয়ায় আসীন আমার পা ধুয়ে দিল যে মেয়েটি শত নিষেধ সত্ত্বেও, তার

খেটে খাওয়া হাতের স্পর্শ কিন্তু নরম। হাঁটু গেড়ে সামনে ঝুঁকে বসায় খাটো আঁচল ওরা যাকে বলে পাঞ্চি, পিঠ হতে সরে গিয়েছে। খোঁপার নীচে ঘাড় পুরুষ্ট, নিটোল কাঁধ হতে মসৃণতা ছড়িয়ে পড়েছে, একটা অগভীর খাদ শিরদাঁড়া বেয়ে নেমেছে পাঁড়হাড় অর্থাৎ কোমরের কাপড়ের বাঁধন ছাড়িয়ে আড়ালে। চোখ পিটপিট করে, আমার দৃষ্টিতে যে পাপ।

সূর্য পাটে বসেছে। ঘরে ঘরে উনোনে ভাত ফুটছে বনবাদাড়ের শুক্‌নো আগাছার ডালপালার জ্বালে। বন্ধু সঙ্গে চা গুঁড়োদুধ এনেছিল। পা-ধোয়ানী মেয়েটিই চা করে আনল। পরিচয় পেলাম বন্ধুর বোন, পাশের গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে। তিন বছরেও পেটে ছেলে ধরতে পারেনি এই দোষে বাপের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে অন্য মেয়েকে ঘরে তুলেছে। শুনে আমি হতবাক। আগের পাপদৃষ্টি একথা জেনে বিস্ময়বিমূঢ়। সভ্যতার মোড়কে জড়ানো আমরা এক্ষেত্রে শুধু একটা বেদনাবধুর বিমর্ষ নারীকেই কল্পনা করতে পারি। অথচ যে কদিন সেই অরণ্যবাসে ছিলাম আমি ঐ মেয়েটিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছি, কিন্তু তার কোন বিকার লক্ষ্য করিনি। দেহের প্রতি অঙ্গের ঢেউ যেন অহরহ প্রাণখোলা হাসির গমকে উথোলিপাথালি। চোখ দুটো সদাই চকমক করে, কোন বিষাদের ছায়া তাকে ঢেকে রাখেনি।

সূর্যাস্তর সংগে খাওয়ার পাট সাঙ্গ। পান্‌তা আনতে নুন ফুরিয়ে যায় যাদের তাদের ঘরে আঁধার ঘোচাতে সাঁঝের প্রদীপ জ্বালতে তেল জোটে না। জানি না অন্ধকারে ওরা দেখতে পায় কিনা। কিশোরী রাতে ওদের কাটাছেঁড়া কথা, পায়ের শব্দ শুনতে পাই। যুবতী-রাতে মাদলের তা ধিন্ ধিন্ বোল নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দেয়।

একখানা ঘর। ওখানেই ছোট বড় ভাই বোন, মা বাবা, শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী বৌ সকলের আশ্রয়। আজ ওটা আমার দখলে। খাটিয়াতে খড়ের গালিচার উপর সুতির চাদর মাত্র। পা-ধোয়ানীর

খবরদারি এখানেও। আলো নাই ; আতুর গায়ে ওর সুখসুবিধার খবর নেওয়ার উষ্ণহাতের ছোঁয়া লাগে। জানি না ওর মনে কি ছিল ; আমার আবাল্য শিক্ষা সংস্কার কটু-চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। ওরা সবাই বাইরের দাওয়ায় ; আমার বন্ধুও। কতদিন পরে বাড়ী এসেছে ; স্ত্রীর নিরালা সঙ্গর জন্য আড়ালের বালাই নাই। আমরা শিক্ষিত, ভাবতেই পারিনা এমনটি। ওদের কোন ক্ষোভ নাই, মুখের আদল বদল হয় না।

এদের নিয়ে সাত সতেরো ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরে ঘুম ভাঙ্গল পাখির ডাকে ; আলোর ছটা তখন সন্ত বনানীর মগডাল ছুঁই ছুঁই করছে। এরই মধ্যে ওরা কাজে বের হবার জন্য তৈরী। গতকালের ফোটানো ভাতের অর্ধেকটা জলে ভেজানো ছিল। তাই একছ'মুঠো উঠেছে সকলের মুখে। আমার কপালে ভদ্রলোকের চা। বন্ধু এসে সামনে দাঁড়াল। অবাক হলাম। শহুরে জামা কাপড় ছেড়ে এখন পরণে শুধু গামছা, হাতে কুড়ুল। বলল, —তুমি গড়িয়ে নাও। আমি বৌকে একটু সাহায্য করি। দুটো পয়সা বেশী জুটবে।

আমার চোখের ভাষা বুঝে হেসে বলল,—বন আমাদের ধাতা, বন মাতা। ঘরে এলে টান দেয়, নাড়ির টান। আর তাছাড়া—

কথা থামিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বলল, -বনই আমাদের ঘর। বেরিয়ে পড়লে গাছের আড়ালে বৌকে একটু কাছে পাবো। যাকে বলে তোমাদের কৃষ্ণর কুঞ্জবন।

হেসে সায় দিলাম,—ভাল ভাল। যাও। কিন্তু আমি সারাদিন একা একা কি করব ?

সে অবাক হল,—কেন ? তুমি আমাদের দেখতে এসেছ। বুড়ো বুড়িরা গাঁয়ে থাকবে। তাদের সঙ্গে গল্প করো, শোন আমাদের কথা। আশেপাশে ঘুরবে। গাছগাছালি দেখবে। ওদের কাছে

দাঁড়ালে শোনার মন থাকলে বাতাসের টানে, বন-মোরগের পাখার ঝাপ্‌টায় দেখবে ওরাও কত কথা বলবে।

এমন সময় দরজার ফ্রেমে পা-ধোয়ানীর হাসির ঝিলিক। বন দেখাতে উষ্ণ আহ্বান।

ভাই ও বোনে কি কথা হল বুঝলাম না। তার উচ্ছ্বাস তরঙ্গে মনে হল দাদাকে সে জানিয়ে দিল,—ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোর ভদ্দরলোক বন্ধুকে ঠিক ঠিক দ্যাখভাল করব। যেমনটি নিয়ে যাবো, তেমনটি ফিরিয়ে আনব। প্ল্যাসটিক পুতুলের মত টোল খাবে না কোথাও।

সে সরে গেল। বন্ধু বলল,—তবে তুই ওর সঙ্গে ঘুরে আয়। আমি বেরুচ্ছি। অনেকক্ষণ ওরা রওনা হয়েছে, সঙ্গ ধরতে হবে।

অবাক হলাম। একটা রাত পার হয়েছে মাত্র। তবু অচেনা এক পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে যুবতীর দ্বিধা নাই, অভিভাবকের কোন জড়তা নাই। অথচ শিক্ষিত সমাজে কত ভয়, কি ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা।

এ যাত্রার তৈরী হওয়ার কিছু নাই। তবু পায়জামার উপর পাঞ্জাবী চাপাতে না চাপাতেই হাতে টান। ওর যে তাড়া আছে; হয়ত সেও সঙ্গ ধরতে ছুটবে। হাত বাড়িয়ে ঝোলাটা টেনে নিলাম। কিছু হারানোর ভয়ে নয় সিগারেটের টানে।

বনপথ। অনেক জায়গায় পাশাপাশি দুজনে চলা দায়। মহীরুহ আর আগাছার ফাঁকে ফাঁকে অজ'নার উদ্দেশ্যে যাত্রা। নানা রংএর ফুল পাতা প্রজাপতি; মাঝে মধ্যে পাখীর সাড়া।

বললাম,—আর সবাই বোধহয় অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে।

সে হেসে জানিয়ে দিল ওরা অন্য পথে গিয়েছে। এটা ভিন্‌পথ।

ভিন্ন পথ জেনে অজানা শঙ্কায় অকারণে কুঁচকে গেলাম এক মুহূর্ত। কে জানে কি মনে আছে ওর। শিক্ষার খোলসটা অঙ্গে লেপটে রয়েছে; কোন কিছু সহজভাবে নেওয়া যায় না। যাক্‌গে

যাক্। ফেরার পথ চিনি না। অতএব ডাইনির সম্মোহিনী টানে আটকে রইলাম।

আমরা একটা ঢালু পথে নামছিলাম। সামনে পথ কেটে বইছে পাহাড়ী ঝোরা কিশোরীর কাকলি ছড়িয়ে। কাকচক্ষু জল। সে জামার খুঁটি ধরে টেনে ঐ পথের ধারেই বসিয়ে দিল একটা কালো-পাথরের চাঁইএর উপর। জানালো হাটবাজার হতে ফিরে এখানেই ওরা আসে রোজ খাবার জল নিতে, স্নান সারতে। এখন জনমানুষ-হীন নিঝুম। আগে বুঝিনি, এবার বুঝলাম কাটারির সঙ্গে জামবাটি আর ঘটি কেন। কাটারিটা গাছে গুঁজে রেখে সে তরতর করে জলে নেমে গেল। ঘটিবাটি ধুয়ে একঘটি জল নিয়ে ফিরল: আমার সামনে নামিয়ে রেখে কোমরের বাঁধন আলগা করে ছোট্ট একটা পুঁটুলি বের করল। কাঁচা শালপাতার মোড়ক খুলে ঢেলে দিল বাটিতে ভুট্টার ছাতু। আরেকটা ছোট মোড়কে এক চিম্‌টে নুন। এই বুনো পরিবেশে ঐ আদিবাসী যুবতীর সাজিয়ে দেওয়া প্রাতঃরাশ সহরের কাঁটা চামচের চেয়ে অনেক আন্তরিক। খিদে সহ্য করতে না পারা ভদ্দরলোক আমি ছাতুর পিণ্ড মুখে তুলছি, সে সামনে বসে পা ছড়িয়ে। মুখ তুললেই চোখে চোখ পড়ে, সে অকারণ হেসে খান খান। দেহের হিল্লোলে বুকের কাঁপনে পাঞ্চি পড়ে খসে। সরম নাই, সচ'কত হয় না যৌবন ঢাকতে। সজ্ঞানে কি সরলতায় এই ভুলোভাব জানি না। কিন্তু ওর চোখের আকাশে আমার মাকে দেখতে পেলাম।

সেই কোন্ কিশোর কালের কথা। সকাল বেলায় সুযোগ বুঝে এক প্রস্থ ডাংগুলি খেলতে গিয়ে রোজই পাঠের সময়ের ঘণ্টা বেজে ওঠে: কাকস্নান সেরে চুলে চিরুণী বুলিয়ে জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে হাঁক—ভাত দাও। জানি, মা ভাত বেড়ে বসে আছে। ডাল মাখিয়ে হাপুস হুপুসে গিলে খাওয়া। খাবো কি; চোখের সামনে তখন বলহরি স্যারের বেত নাচছে। হাজিরায় দেরী

হলেই বেঞ্চে বসার উপায় নেই, তার উপরে দাঁড়িয়ে দু'কান ধরে মাঠের কাকতাড়ুয়ার হাল। যতবার উঠতে যাই, মা হাত চেপে ধরে,—আর এক গেরাস খা বাবা।

সেই একই স্পর্শ। খাওয়া বন্ধ করেছিলাম; সে হাত চেপে ধরেছিল। উঃ! কতকাল পরে সেই অনুভূতি। কবে মাকে হারিয়েছি। তবু স্পষ্ট ভেসে উঠল মুখখানা; বার্ধক্যের আঁচড়কাটা মুখ নয়, সেই বাল্যকালে যতদূর পিছিয়ে যাওয়া যায় সেই মুখ। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে চোখে জল উপচে উঠল। হাতটা মুখে তুলতে জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় সে হতবাক। উদোম বুক শ্বাসবন্ধে নিথর গিরি-শিখর।

মা তখনও আমাকে ঘিরে আছে। বাল্যকালে একবার হুজুগে পড়ে গলায় দড়ি দেওয়া লাশ দেখেছিলাম। খুন না আত্মহত্যা জানি না। জিভ বের হয়ে আছে, মানুষের জিভ এত লম্বা হয় জানতাম না। চোখ দুটি ঠিকরে পড়ছে, ছড়ার বই-এর রাক্ষসের মত। দিনের আলোয় দেখলাম বেশ ঘুরে ফিরে রসিয়ে। রাতে আর চোখের পাতা এক করতে পারি না। চোখ বন্ধ করলেই লাশটা দুলছে। অনেক চেষ্টাতেও ওটাকে সরাতে পারলাম না। আমার জায়গা ছিল খাটের শেষ প্রান্তে, মা শুতো ঐ একই বিছানার উলটো মেরুতে। আমার ফুঁপিয়ে কান্না শুনে মা সাড়া দিল, ডেকে নিল কাছে। সত্য স্বীকার করলাম, মা অভয় দিল,—দূর বোকা। মা কাছে থাকলে ভূতপেত্নী কেউ কিছু করতে পারে না।

বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল,—ভয় নাই, ঘুমো। সেদিন মায়ের উদোম বুকে মুখ গুঁজে ভরসা পেলাম। মাই-এর বোঁটা দুঠোঁটে চেপে অজ্ঞান শিশুর মত সেই ধেড়ে-বয়সী আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। লাশটাকে আর দেখিনি।

আনমনে 'মা' শব্দটি উপচে পড়ল।

তার ভয়ব্যাকুল চোখের জিজ্ঞাসাকে আশ্বস্ত করে হেসে বললাম, —জিভ কামড়ে ফেলেছি। আমি কিন্তু আর খেতে পারবো না।

নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে গড়িয়ে আমার জানুতে কপাল ঠেকিয়ে জানাল সে ভেবেছিল আমার বোধহয় ভুট্টোর ছাতু খেতে কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু কষ্টবোধ সে সময় অন্য কারণে আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। গতকাল যাকে মনে হয়েছিল দয়িতা, তার স্পর্শে মাতৃত্বের ছোঁয়া। মনে হল বলি,—তোমার ঐ খোলা বুকে আমাকে একবার মুখ রেখে মায়ের উষ্ণ সাহচর্য পেতে দাও।

আমার বিশ্বাস হাত বাড়িয়ে চাইলে ফিরিয়ে দিত না। কিন্তু আমার শিক্ষার শানপাথরে ঘষামাজা বোধের সাধ্য ছিল না মনের বাসনা সরল ভাবে প্রকাশ করার। যা বাক্‌স্ফুরণে মূর্ত্ত হত তার মেকী রং-পালিশ ওর চাহনিতে ধরা পড়ত হয়ত অন্যভাবে।

আমি হাত গুটিয়ে নিতে সে বাটিটা তুলে নিল নিজের কোলে। আমি হাত ধুয়ে জল খেয়ে সিগারেট ধরালাম। সে উচ্ছিষ্টটা শেষ করে ঘটিবাটি ধুয়ে এনে ওঠার তাগিদ দিল।

বন বড় বিচিত্র স্থান। এবেলা ওবেলা রূপ পালটায়। ঋতুর সঙ্গে সাজের বদল: কত বিস্ময় অপেক্ষা করে এখানে ওখানে। পায়জামা হাঁটুর উপর তুলে ঝোরা পেরিয়ে আরও নীচে নামা। এখন ঘটি বাটি আমার ঝোলায়, ওর হাতে শুধু কাটারি। পাঞ্চি-পাঁড়হাড়্ আঁটসাট সামলানো। আগে পা-ধোয়ানী তড়বড় করে হাঁটছে কাঠবিড়ালীর মত হয়ত সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে। পিছনে আমি অচিন পথে প্রায় ছুটছি। মিনিট দশেক বড় জোর, বাঁক নিতেই সামনে দেখলাম একটা নিঃসঙ্গ কুটির। যা স্বাভাবিক তাই মনে হল, বোধহয় কোন ঈশ্বরসন্ধানী সাধুসন্তর গোপন সাধনপীঠ। প্রশ্ন রাখতেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে শক্ত চাপা গলায় জবাব দিল,—ঐ দিকু—

বলেই দেহে মোচড় দিয়ে আমার মুখোমুখী; একেবারে মা কালী স্বরূপা। কঠিন চোয়াল, তীব্র চাহনি, দন্তাগ্রে আবদ্ধ লোলজিহ্বা। মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই হাসির ঝিলিকে সরলতার বিকাশ,—তুকে বুলি নাই। ঐ যি গো বনবাবু, উর ডেরা।

আমার মুখে ছিল জলন্ত সিগারেট। ওটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে যেন প্রমাণ দিতে চাইল আমি দিকু নই, ওদের আপনজন। এর প্রয়োজন ছিল না, আগেই ত উচ্ছিষ্ট খেয়েছ।

উঠোনে পা দিতেই রাষ্ট্রভাষায় হাঁক,—কৌন রে।

শব্দের সঙ্গে লাঠি হাতে মানুষটাও বেরিয়ে এলো ঘর হতে। আদিবাসী যুবতীর সঙ্গে শহুরে ধাঁচের আমাকে দেখে একটু থমকে গেল। বার দুয়েক কেশে গলা সাফ করে চোস্ত বাংলায় বলল,— বন দেখতে এসেছেন? দেখুন, অনেক কিছু দেখার আছে।

লোকটার পরণে খাঁকি সার্ট প্যাণ্ট। বেশ লম্বা। হাফপ্যাণ্টের সীমা ছাড়িয়ে শীর্ণ মসীকালো দুটো পা যেন একজোড়া আধপোড়া বাঁশের খুঁটি। শেষমাথায় রবারের চপ্পলে পায়ের পাতা মোড়া। মুখমণ্ডলে মাংসের বালাই নাই, হাড়গুলো চামড়ায় ঢাকা শুধু। কিন্তু এক মাথা সাদা কালো চুল, বাবরি ছাঁটে তেল চুকচুকে। পালোয়ানী ছাঁদের গোঁফটা মনে হয় জোর করে বসিয়ে দেওয়া। লিকলিকে পোড়াকাঠ হলে কি হয় গলার স্বরে জোর আছে। ওর কথার জবাব দিলাম না, সেও হয়ত প্রত্যাশা করেনি। আমাকে ছেড়ে পা-ধোয়ানীকে নিয়ে পড়েছে। আদিবাসী ভাষায় দু'পক্ষের উতোর-চাপান চলছে। এর যত দাপট, আমার সঙ্গিনীর তার চতুর্গুণ আকুতি মিনতি।

এই দৃশ্যে আমার মৃত সৈনিকের ভূমিকা। কোন কথা বুঝছি না। বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে। একটা সিগারেট ধরালাম। লোকটা আড়চোখে দেখল। কথা থামিয়ে দামী ধোঁয়ার গন্ধ টেনে নিল

চড়ুই পাখীর মত ছোট বুকের খাঁচা ভরে। বোধহয় এবার যেন ওদের দরদস্তুরীতে রফা হয়েছে। লোকটা বলল,—আপনি এই মাচানে জিরেন নিন, আমি ওকে গাছ চিনিয়ে দিয়ে আসি।

বলে লোকটা শিয়ালের মত খ্যাক খ্যাক করে হাসল। গা ঘিন ঘিন করা হাসি, নোংরা চাহনি।

পা-ধোয়ানীও হেসে জানিয়ে দিল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাজ হাসিল করে সে ফিরবে। ওরা চলে গেল কুটিরের পিছন দিকের পথ ধরে। আমি উঠোনের বাঁশের তৈরী মাচানে চেপে বসলাম। হঠাৎ মনে হল বনের মেয়েকে গাছ চিনিয়ে দিতে হবে কোথাকার হরিদাস পাল বনরক্ষীকে। বনের ব্যাপার, বনের আদবকায়দা আমার জানার কথা নয়। তবু কৌতুহলে নেমে কুটিরে ঢুকলাম। ঘরের কটুগন্ধে মালুম হল লোকটা আমরা আসার পূর্বমুহূর্তে নিশ্চয়ই গাঁজা টানছিল। আসবাব বলতে প্রায় কিছুই নাই। ভিতরে একটা দড়ির খাটিয়ায় নোংরা কাঁথার উপর তেল-চিটচিটে বালিশ। ঘরের কোণে একটা কলসী, বোধহয় জল আছে। এর পাশে উনুন, এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি থালা বাটি গ্লাস ইত্যাদি। দেওয়ালে কাঠের তাকে গুটিকয় টিনের কৌটা, নিশ্চয়ই চাল ডাল রাখে। খাটিয়ার নীচে একটা ঝুড়িতে সামান্য আনাজ, আরেকটা ছোট কলসী সেখানে মাটির সরা চাপা। ঢাক্‌না খুলতেই পচুই-এর গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে অনভ্যাসের কারণে। খাটিয়ার পায়ের দিকের দেওয়ালে পুরোণ দেওয়ালপঞ্জীর ছবি; উপরে মা কালী আর নীচে বোম্বে সিনেমার স্বল্পবাসা নাচুনি। একটিমাত্র জানালা পিছনের দেওয়ালে। ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের খুঁজতে গিয়ে থমকে গেলাম। হে ধরণী দ্বিধা হও; তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে লজ্জার হাত হতে আমায় নিস্কৃতি দাও। পরশুরামের মত আমার বীর্যবত্তা নাই মাতাকে কবন্ধ করার। শ্বেত-কেতুর মত গুণধর নই যে পিতার সম্মুখে মাতার স্বেচ্ছায় পরপুরুষে গমনে মুহ্যমান হয়ে সতীত্বের বিধান দেব যা সমাজবদ্ধ জীব মেনে

চলতে বাধ্য থাকবে। আমার বুকের খাঁচা খুবই ছোট, সামর্থ নাই ভীমসেনের কীচকবধের মত লাফ দিয়ে ঐ জন্তুটার কেশর ধরে ছুঁড়ে ফেলে অবলার ইজ্জৎ রক্ষা করি। আমি নিজেকে সভ্য বলে বড়াই করি, শিক্ষিত হিসাবে গুমোর দেখাই ; হয়ত সেকারণেই ঐ ঘটনা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস নিই। কিন্তু চোখ সরে না। জানি না এর মধ্যে আদিম কোন অবদমিত স্পৃহা রয়েছে কিনা। লোকটা মেয়েটাকে টানাটানি করছে বোধহয় ঘাসের উপর শোওয়াতে।

সে শক্তভাবে জড়িয়ে আছে দুটো হাত পিছনে ঘুরিয়ে এক নবীন শালতরু। ডানহাতে কাটারিটা ধরা। কঠিন চোয়াল, আগুন ঝরানো দুটি চোখ। জানোয়ারটার তর সয় না। সেভাবেই উপরি পাওনা উশুল করে নিল। কয়েক লহমার ব্যাপার। ছাড়া পেয়েই সে থুতু ফেলল ; হয়ত চরম ঘৃণায়। লুটিয়ে পড়া পাঞ্চি তুলে মুখের ঘাম মুছে বেশবাস ঠিক করে নিল। আবহসঙ্গীতের মত শিয়ালের খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি কানে বাজে। সে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল বনের অন্দরে মার খাওয়া সাপিনীর মত হেলে দুলে। কাক-তাড়ুয়াটা লম্বা লম্বা পা ফেলে টালমাটাল হয়ে ফিরছে কুটিরের দিকে। আমি পিছনে বাইরে ছিটকে পড়ে মাচানে উঠে বসলাম। কি এক অদ্ভুত অজানা শঙ্কায় বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে সামলাতে গিয়ে মনে হল চীৎকার করে বলি,— ওগো বনানী! কি অপরূপ তোমার লীলা। এত ঘন সান্নিধ্যে না এলে কোন দিন জানতে পারতাম না তোমার এক স্তনে অমৃতধারা, অন্যটিতে হলাহল।

আমি বিষের জ্বালা নিয়ে লোকটাকে দেখলাম মাচানের একপাশে পা ঝুলিয়ে বসতে। সে একটা ভুতুড়ে হাত বাড়িয়ে বলল,—একটা সিগারেট দ্যান বাবু। গন্ধটা বড় মিষ্টি।

ওর মুখে আগুন ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—কি নাম তোমার ?

ভুস ভুস করে ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিল,—আজ্ঞে, ঘাসিরাম মাহাতো।

বাড়ী কোথায়?

অনেক দূর; রাইপুর থানায়, একেবারে শেষে মেদিনীপুর জেলার কোল চেপে।

ঘরে কে আছে?

দুই বৌ, এক ছেলে, তিন মেয়ে।

সিগারেটের শেষটুকু টুস্‌কি দিয়ে ছুঁড়ে বললাম,—দুই বৌ কি রকম?

বিস্ময়ে ভুরু কুঁচ্‌কে জবাব দিল,—কি রকম মানে। প্রথমটা বাঁজা, বিয়েন দিল না। তাই আরেকটা ঘরে আনলাম।

আমি থ। কত সহজ জীবন। এবং এতেও হয় না। জঙ্গলে জংলীর মত উপরি আদায়ের ধান্দা। কেমন অদ্ভুত লাগল লোকটাকে। শয়তানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। সঙ্গটা ভাল লাগছিল না। স্বভাব বশে বাম হাতের কব্‌জি ঘোরালাম। ঘড়ি নাই, বেরুবার সময় নেওয়া হয়নি। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।

আমাকে চুপ করতে দেখে সে প্রশ্ন তুলল,—কি উদ্দেশ্যে আপনার এখানে আসা।

নিস্পৃহ জবাব,—বন দেখতে।

কুটিল হাসি ছড়িয়ে ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়ে বলল,—তা বটে। সবাই তাই বলেন। আসলে—

পকেট হতে কৌটা বের করে সে মাথা নীচু করে মন দিয়ে খৈনী দলতে শুরু করল। বললাম,—আসলটা কি?

সে ট্যারা চোখে আমাকে দেখে নিয়ে বেশ কায়দা করে দুই আঙ্গুলের টিপে খৈনীটা ঠোঁটের তলায় গুঁজে দিয়ে জবাব দিল,—কখন সখন দু'চারজন পাগলাটে বাবু আসেন; তারা ঘুরে ঘুরে নানা গাছগাছালির পাতা ফল সংগ্রহ করে, কেউবা পোকামাকড় প্রজাপতি

ধরে কাঁচের শিশিতে জমায়। একবার একজন এলেন কাঁধে বিরাট ঝোলা, হাতে এক বাণ্ডিল কাগজ। এদিক ওদিক ভাখে, আর গাছে হেলান দিয়ে বা মাটিতে বসে ছবি আঁকে। মজাদার লোক। এক রাত আমার সঙ্গেই কাটিয়ে দিল, সেরেফ মাল টেনে। আর যারা, তারা গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে বন দেখার নামে আদিবাসী মেয়ের গা চাটার জন্য ছুকছুক করে। এরা এত সাতপাঁচ বোঝে না। ওরা দূর হতে নজর রাখে, কাপড়-চোপড় এদিক-ওদিক সরে গেলেই পটাপট ছবি। দু'হাতে টাকা ছড়ায়, ওদের ডুংরিতে হাঁড়িয়ার ভোজ দিয়ে জমে যায় নিজেরাও। যতটুকু যা পায় চেটে-পুটে ফূর্তিহুল্লোড় করে ফিরে যায়। এরা খুব সরল মানুষ; জানোয়ার-গুলো সেই সুযোগ নেয়।

কাকতাড়ুয়ার শিয়ালের হাসি।

এ কি কথা শুনছি। ভূতের মুখে রাম নাম। ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল,—তাহলে তুমি কি? জানোয়ারের বাপ?

বলা হল না। জানি না, বন যারা পাহারা দেয় আর বনে যারা কাঠ কাটে তাদের অলিখিত চুক্তিটা কি। বললাম,- তুমি ত অনেক দেখেছো। কত বছর এই চাকরী করছ?

পিচ্ করে খৈনীর লালা ফেলে বলল, —তা এক কুড়ি হল। স্তাখার কথা বলছেন, আরও অনেক দেখেছি।

গল্পের গন্ধে ওকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম। সে সেটা কানে গুঁজে রাখল। নিজেরটা ধরিয়ে ওর দিকে আগুন বাড়াতে বলল, --থাক পরে ধরাবো। মজার একটা ব্যাপার শুনুন।

শুনলাম ওর কথা। একবার ডাক পড়েছিল রাণীবাঁধ ডাক-বাংলোয় বড় সাহেবের কাছে। হাজিরা দিতেই সাহেব বললেন,—ঘাসিরাম! তুমি ত ওস্তাদ লোক। ওরা কোলকাতা হতে এসেছেন। এদিকের ছবি তুলবে, বনবাদাড়ের। সিনেমায় দেখানো হবে। তুমি এদের সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?

ঘাসিরাম জবাব দিল,—হুজুরের হুকুম হলে বাঘের দুধ জোগাড় করতে পারি স্যার।

সাহেব খুশী হয়ে পাইপ টানতে লাগলেন। ঘাসিরাম পাশের লোকগুলোকে এক নজর দেখে নিল। রেন্‌জার বাবু রেলিংএ মাজা ঠেকিয়ে গরুড়পক্ষী হয়ে আছে। সাহেবের গাড়ীতে মালপত্র উঠছে। রথের রশিতে টান পড়ার অপেক্ষা। সাহেব উঠে পড়ে বললেন,—তাহলে ধরনীবাবু, আমি চলি, ঝিলিমিলি ঘুরে ফিরে যাবো। এখানে আসছি না। ঘাসিরাম থাকল, কোন অসুবিধা হবে না। চক্রবর্তী বিকেলে খোঁজ নেবে আপনাদের।

গাড়ীতে শরীরের আধখানা ঢুকিয়ে বাকিটুকু শেষ করলেন,—কাজ সেরে ফেরার পথে সময় পেলে বাঁকুড়ায় দেখা করে যাবেন।

ধরনীবাবুরা তিনজনে একসঙ্গে কলকল করে উঠল,—নিশ্চয়ই। অনেক ধন্যবাদ।

গাড়ী নুড়ি বিছানো রাস্তায় গড়াতে শুরু করল মড় মড় শব্দ তুলে, যেন মনের সুখে মুরগীর ঠ্যাং চিবুচ্ছে। চক্রবর্তী মানে রেন্‌জার বড় সাহেবকে সঙ্গ দিতে গেল।

ঘাসিরাম কোমর হতে উর্ধ্বাংশ যতটা নোয়ানো যায় সেই ভঙ্গীতে বিদায়ী প্রণাম জানালো। রথকে না জগন্নাথকে কে জানে।

এখন ঘাসিরাম ধরনীবাবুর হুকুমের অপেক্ষায়। চৌকীদার রওনা দিল রাণীবাঁধের হাটে এদের ভোজনের মালমশলা জোগাড় করতে। বড় সাহেবের হুকুম, নির্ঘাৎ জান পহ্‌চান আদ্‌মী। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত হয়। একথা ঘাসিরাম জানে ভাল। অতএব পরের কাজের আদেশ না পেলে আস্তানায় ফিরতে পারছে না।

এরা লোক ভাল, দিলদরিয়া মেজাজ। ধীরে সুস্থে আপনজনের মত কাজকর্ম বুঝিয়ে দিল। আজ বিশ্রাম, শুধু স্থান-পাত্রর ঠিকঠাক অন্ধিসন্ধি করে রাখা। কাল এসে নিয়ে যেতে হবে এদের।

ওঠার সময় আসল কথাটা উঠল। ঘাসিরাম কি জানত ঝোলায় বেড়াল আছে। হয়ত বড়সাহেবও টের পায়নি, তাহলে নিশ্চয়ই ঘাসিরামকে এমন গাড্ডায় ফেলে চলে যেতেন না। ছবি উঠবে গাছগাছালির, পাখপাখালির, ঝরণার, কপাল ভাল হলে দু'চারটে জন্তু জানোয়ারের। কিন্তু তার মধ্যে আবার মানুষের ভীড় কেন, তাও আবার বাছাই করা মুখ, মজাদার ছবি।

ঘাসিরাম বুঝে নিল বলা সবকিছু সহজ, কিন্তু সত্যিই বাঘের দুধ আনতে যাওয়া মানে জান খোয়ানো। বড়সাহেবকে কবুলতি দিয়ে এখন ফিরে আসার পথ খুঁজে পায় না।

ধরনীবাবু পকেট হতে একতাড়া করকরে নোট ছুঁড়ে দিতেই টিকটিকির আরশুলা ধরার মত টুপ করে লুফে নিল ঘাসিরাম। দশ টাকার বাণ্ডিল, শক্ত পিনে আঁটা, অর্থাৎ নিট এক হাজার। জীবনে সে কোনদিন এক লপ্তে হাজার টাকা ছোঁয়নি।

ধরনীবাবু বললেন,—এখন ওটা রাখো। কাজ হাসিল হলে আরও পাবে।

ঘাসিরামের চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল লোভে। আরও পাবে। তার মানে ঠারে ঠোরে তেমন বাঁচাতে পারলে দু'বিঘে জমি বাড়বে, ঘরের চালে টালি উঠবে। ঘাসিরাম জড়িয়ে পড়ল। প্যাঁচ কষতে শুরু করল পথ চলতে চলতে কেমনভাবে বাঘিনী ধরা যায় জালে।

কুথাকে যাবেক।

চমকে মুখ তুলে ঘাসিরাম আশার আলো দেখল। কাকের মাংস কাকে খায় না এ তাহা মিথ্যা। নিজের জাতের লোক জাতশত্রু। একবার চুরি করে গাছ বিক্রী করে দেওয়ার দায়ে ওরই এক সহকর্মী ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। সে চুক্‌লি না কাটলে সাধ্য ছিল না তাকে জড়ানোর। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে যাত্রা চাকরী বাঁচিয়েছিল।

ঘাসিরাম বিগলিত হয়ে বলল,—তুমাকেই ঢুঁড়ছিলাম।

আদিবাসী ছোকরাটি চালু পুরিয়া। অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যা নিয়ে স্বজাতির মধ্যে কেউকেটা মানুষ। নেংটি গামছা পরে না, লুঙ্গি জামায় আব্রু ঢাকে। খেত-খামারে গতর খাটায় না, ঝাঁটির বোঝা মাথায় নিয়ে হাটে যায় না। সকাল বিকাল বাজারের চায়ের দোকানে বুকনি ঝাড়ে। ইচ্ছা হলে বাঁশি বাজায়; দারুণ বাজায়। হাটুরে লোকের ভীড় জমে যায়। ওকে চেনে এ অঞ্চলের তাবৎ লোক, মান্যি করে খেটে খাওয়া মানুষরা। করতেই হবে। ধান রোয়া আর কাটা দুই মরশুমে বর্ধমান হুগলীর চাষীঘরের লোক এসে ওকেই মুরুব্বী ধরে। সে দল ঠিক করে, মজুরী বেঁধে অভাবীজনের কাজের উপায় করে দেয়। হিস্যা পায় দু'তরফেই। বছরে ভাল রোজগার দালালী করে। চোরাই কাঠের চালানদারী হতে তোলা ওঠে মোটা। গাঁয়ের ঝুটঝামেলার ফয়সালা করতে তার ডাক পড়ে, ও যে লিখাপড়া শিখে অনেক জানে। হাঁড়িয়া খায় ইচ্ছাসুখে; পয়সা দেয় না। শুঁড়ি কিল খেয়ে কিল হজম করে। ঘাঁটালে ব্যবসা লাটে উঠবে। ভাল মানুষদের গতর খাটানো পয়সার মালে জল মিশিয়ে লাভের অঙ্ক ঠিক রাখে।

সে আর ঘাসিরাম মাল খেয়ে বনের মাচানে ফিরল। ভেঙ্গেচুরে বলল সব কথা। শলাপরামর্শ হল দু'জনে, রফা হল টাকাপয়সার। লেনদেন সাঙ্গ করে সে ওঠার মুখে জানিয়ে দিল এটা কোন ব্যাপারই নয়। টাকাকড়ি ঠিক থাকে যেন।

ঘাসিরাম সায় দিয়ে হুঁশিয়ারী দিল কাছাকাছি ডুংরীতে ছিপ না ফেলাই ভাল।

ছোকরা হাসি ছড়িয়ে অভয় দিয়ে বুঝিয়ে দিল বুনো হাতি ধরতে হয় কুটনী দিয়ে। বলে বীরদর্পে ফেরার পথ ধরল।

ছোকরা অসাধ্য সাধন করেছিল। পরদিন সূর্য গরম হওয়ার আগেই একপাল শিকার নিয়ে হাজিরা দিয়েছিল। ভীষণ খুশী ধরনীবাবুরা। অঢেল হাঁড়িয়া আর তেলেভাজার আয়োজন। ধামসা

মাদলের নেশা ধরানো দ্রিম দ্রিম তাল। মগজ সবার ঝিমঝিম, চোখে কিছু পড়ে না। যেমনটি বলা হয় তেমনটি করে নির্বিচারে; হেসে নেশার ঝোঁকে। বনে যাদের বাস বন্যভাবেই তাদের ধরতে হবে ক্যামেরায়, নইলে বাস্তবসম্মত হবে না। সহরের ঐ বাঁদর-ওয়ালার পায়ে ঘুঙুর কোমরে লাল ঘাঘরা বাঁদরকে বনে এনে গাছের ডালে বসিয়ে ত ছবি তোলা যায় না। এত টাকা খরচ করে বনবাসীনিদের নাচহুল্লোড়ের ছবিতে আড়ালের আড়কাঠি থাকলে সার্থকতা কোথায়। প্রকৃতির বুকে বনবালাদের অঙ্গে তাই ছিল না কোন বাস। আসবে আচ্ছন্ন ওদের চোখে ছায়া পড়ে না সামনের ক্যামেরার। পরিবেশ পরিস্থিতি কাল সব ভুলে ওরা উদোম নাচে উদ্দাম, যেন পিছিয়ে যায় তাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহর কালে।

মনে মনে ভাবলাম,—সেইদিন সেই সময়ে বনানীর স্তন হতে শুধু হলাহল ঝরেছিল নিশ্চয়। পেটে ক্ষুধার জ্বালা নিয়েও যারা প্রাণখোলা হাসি বিলোয়, সরল মনে মানুষকে যারা সহজেই বিশ্বাস করে, অতি অল্পে তুষ্ট হয়ে কৃতজ্ঞতায় যারা সদাই নত; সভ্যতার সাদা পোষাকে ঢাকা অন্য মানুষগুলোর কুৎসিত ঘৃণ্য মনের বিকৃত বাসনার শিকার হয় তারা না বুঝে না জেনে।

ধরনীবাবুরা আশাতীত সাফল্যে ডগমগ হয়ে আরও কিছু টাকা ছেড়েছিল। ঘাসিরাম সে টাকার ভাগ পায়নি। দালালটা ছোঁ মেরে ট্যাঁকে গুঁজেছিল তবু মোটা টাকাই দাঁও মেরেছিল সে। বেশ মেজাজে ছিল। কিন্তু এ ঘটনার দিন দশেক পরে ফের তার ডাক পড়েছিল রাণীবাঁধ ডাকবাংলোয়। তাকে দেখেই বড় সাহেব রেগে আগুন। হুংকার ছাড়লেন,—সেই ধরনী না ধুরন্ধরগা সেদিন কি ছবি তুলেছিল?

ঘাসিরাম প্রমাদ গুণল। বাবরি চুল খামচে ধরে বলল,—হুজুর! বনবাদাড়ের।

বনবাদাড়ের? বাঁদর কাঁহাকা। মিথ্যাবাদী।

ইংরাজীতেও বেশ কিছু বুক্নি হল, যার অর্থ সে জানে না, তবে বুঝল কথাগুলো মিষ্টি নয়।

এক নাগাড়ে হাঁকড়ে বড়সাহেব চুপ করলেন। একটু দম নিয়ে পাইপে তামাক টিপ্‌তে টিপ্‌তে বললেন, জানো চক্রবর্ত্তী। ঐ লোকগুলো এক নম্বরের চারশো বিশ। চালচলনে এত চোস্ত আমি কিছুই আঁচ করতে পারিনি। জানো—

স্যার!

বড়সাহেব পাইপে আগুন দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কথার জের টানলেন, ওরা আদিবাসীদের নিয়ে ব্লু ফিল্‌ম তুলেছে। কি ঘাসিরাম ঘটনা সত্য?

আদিবাসী শব্দে যা বোঝায় সেইমত জবাব দিল,—হুজুরের হুকুমে আমি সঙ্গে ছিলাম মাত্র। ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করেছিল।

আবার হুঙ্কার,—টাকা পয়সা?

ওরা যা খরচ করার করেছে। আমি ওসব ছুঁইনি। জানিও না কে কি নিয়েছে। এই নাকে কানে খত দিয়ে বলছি হুজুর আমার দোষ নাই।

সত্যিই সে নিজের দু'কান ধরে মার-খাওয়া কুত্তার মত কেঁউ কেঁউ শব্দে চোখে জল ঝরিয়েছিল।

বড় সাহেব বললেন,—জানো চক্রবর্ত্তী।

স্যার। আমিও শুনেছি ব্যাপারটা পরে। অবশ্য এনিয়ে তল্লাটে তেমন কিছু ত হৈচৈ নাই।

সাহেব মুখের পাইপের নলটা পিস্তলের মত সামনে বাড়িয়ে বললেন,—না থাক। ব্যাপারটা কেমন করে ডি. এম.-এর কানে উঠেছে। আমাকে ফোন করেছিল। বলেছি খোঁজ নিচ্ছি। এই রাস্‌কেল খাসিরামটা—

সাহেবের কথার ফাঁকে ঢুকে মাথায় হাত রেখে বলল,—হুজুর খাসিরাম নয়, ঘাসিরাম।

সাহেব পাইপটা দাঁতে চেপেছিলেন, সরিয়ে নিয়ে খেঁচিয়ে উঠলেন,—তোমাকে খাসিরাম করাই উচিত। সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলে না কেন রেন্‌জ অফিসে।

কথার আগে পরে বরাহনন্দন ইত্যাদি নানা বিশেষণে সে বিভূষিত হল। চাকরী রাখতে উপরি পাওনা সামলাতে ওসব ভাষ্য গায়ে আঁচড় কাটে না আর।

সেদিন আরও কিছু গালমন্দ খেয়ে রেহাই পেয়েছিল ঘাসিরাম। মওকা বুঝে শেষে সাহেবকে শান্ত করে দু'দিনের ছুটি আদায় করে নিয়েছিল। এটুকু সে জানে এ নিয়ে কিছু ঘটলে সে একা নয়, বড়সাহেবও জভাবে। অতএব তম্বিহম্বি করলেও নিজে তা বোঝে।

ঘাসিরামের এখন মাল সামলানো দরকার। ছাড়া পেয়ে নিজের ডেরা হয়ে সোজা দেশঘর। তাঁর ঘরের চালে টালি উঠেছে, জমির পরিমাণ বেড়েছে।

ঘাসিরাম বেশ গুছিয়ে রসিয়ে কথা বলে। গল্প শেষে বনবালাদের কথা জানতে চাইলে সে মজার জবাব দিয়েছিল। গরমকালে হাওয়ায় লাল ধুলো উড়ে গাছের পাতার রং বিবর্ণ করে দেয়। বর্ষার জলে সব ধুয়ে মুছে সবুজ হয়। একবার খাওয়ার পর এঁটো শাল-পাতা ফেলে দেয় সবাই। দিন আনি দিন খাই যাদের তারা জীবনের পাতা উল্‌টে দেখতে জানে না। ঘটে গেল, ফুরিয়ে গেল। তাই নিয়ে কপ্‌চে কষ্টকে ওরা পুষে রাখে না, সুখের কথা মনে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না। সকালের সূর্য সারাদিন পৃথিবীর সব পাপ দাহ করে বিকেলে বিবর্ণ হয়ে রাতের ওড়নায় মুখ ঢাকে। পরদিন আবার ঠিক গতদিনের মত। এদেরও তাই। তবেই না অমন করে হাসতে পারে, গায়ে গতরে অটুট স্বাস্থ্য, ভরা যৌবন ঝরতে চায় না সহজে।

বনের কথা অমৃত সমান। বেশ জমে গিয়েছিলাম। বুঝেছি ঘাসিরামের ঝোলায় অনেক গপ্‌পো, খাঁটি সত্য কাহিনী। সবই বিষমাখা তীরের মত; অমৃতের সন্ধান তার জানা নাই। কিন্তু

আমি ত জানি গরল হতে অমৃত উঠে আসে। সাপের বিষে জীবন-প্রদায়ী ওষুধ হয়।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। ঘাসিরাম বলল,—তা বাবু আপনি কেন এয়েচেন?

হেসে জবাব দিলাম,—এই সবাই যেমন আসে। আমারও সেই উদ্দেশ্য।

ওর বড়সাহেবের নাম উল্লেখ করে বললাম,—উনি প্রায়ই এ-অঞ্চলের গল্প শোনান। নিয়ে আসতেও চেয়েছিলেন। আমি ভাবলাম ঐ মাপা গণ্ডীর মধ্যে বনের মানুষের মনের রূপ দেখতে পাবো না। ঐ মেয়েটি, যাকে তুমি গাছ চেনাতে নিয়ে গেলে, তার দাদা আমার বন্ধু। ওদের বাড়ীতেই উঠেছি।

শুনে ঘাসিরামের চক্ষু চড়কগাছ। তড়াক করে মাচান হতে ছিট্‌কে পড়ল। খাড়া দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে একদৃষ্টে আমাকে দেখছিল। হয়ত হিসাব কষছিল আমি ঝুট বলছি কিনা, অথবা একটু আগের ঘটনা আমি টের পেয়েছি কিনা বা মেয়েটি কিছু বলে দেবে কিনা।

ঘাসিরামের গলার স্বর পালটে গিয়েছে। মিউ মিউ করে উঠল,—আপনি সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারবেন। আমাকে আবার ফ্যাসাদে জড়াবেন না যেন। ছাপোষা মানুষ। কোন রকমে পেট চালাই। যা বলেছি সব মিথ্যে হুজুর, সকালে একটু নেশা করেছিলাম, তাই সব উল্‌টো পাল্‌টা বাত্‌চিত। যা করেছি মাপ করে দ্যান হুজুর।

বলেই সোজা পায়ের উপর। কোন রকমে ছাড়ান পেয়ে বললাম,—তুমি কিছু অন্যায় করেছো? মনে ত হয় না।

করেছি বাবু, করেছি। ঐ মেয়েটাকে বনে ঢুকতে দেওয়াই বে-আইনী, আরও বে-আইনী নিজে গাছ চেনাতে যাওয়া। আপনার সামনে সিগারেট খাওয়া পাপ।

হেনকালে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে পা-ধোযানী দেখা দিল। ঘামে মুখখানা চক্‌চকে, চোখে চোখ পড়তেই ঠোঁটের কোণে হাসি।

লম্বা বোঝাটা বেশ কায়দা করে শালগাছে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পাঞ্চিতে ঘাম মুছলো।

ঘাসিরাম আমাকে ছেড়ে ওকে ধরল। ওদের ভাষায় কথা চলে, মাঝে মাঝে আমাকে দেখে মিটিমিটি হাসে। বুঝতে পারি আলোচনার প্রসঙ্গ আমি, আমাকে সামনে রেখে ঘাসিরাম এখন তার খোশামোদ করছে। আর সে নিষ্পাপ বালিকার মত মজা পাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াল। পথ চলার জন্য আঁটসাঁট করে নিল পরিধান। আমি মাচান হতে নামার জন্য পা ঝুলিয়েছি। পা-ধোয়ানী গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল আমি এখন কি করতে চাই। অর্থাৎ এখানেই বসে বাকি সময়টা ঘাসিরামের সঙ্গে গল্প করে কাটানো, হাট সেরে ফেরার পথে সে আমাকে নিয়ে যাবে। অথবা, ঘরে ফেরার ইচ্ছা থাকলে ঘাসিরাম পৌছে দিতে রাজী আছে।

আমি দুটো প্রস্তাব বাতিল করে জানিয়ে দিলাম হাটে যাবো। ঘাসিরাম কষ্টের কথা শুনিয়ে দিল; বনপথে তিন মাইল হাঁটা চড়াই উৎরাই ভেঙে। বললাম,—তা হোক। এসেছি যখন হাট দেখে যাই।

পা-ধোয়ানীর চোখ দুটো নেচে উঠল; মনে হয় সেও মনে মনে এই চেয়েছিল হয়ত। সে কাঠের বোঝা মাথায় তুলে পথ ধরল। ঘাসিরামের লম্বা প্রণামের সঙ্গে আবার পায়ের ধুলো দেওয়ার আবদার পাশেয় করে আমিও পথে নামলাম ওর পিছনে পিছনে। বনের পথ। ভয় ধরানো ঘন নয়। পথের ধুলোয় রোদ ছায়ার লুটোপুটি। পাখী ডাকে নানা স্বরে। দেখা হয় বারকয়েক শঙ্কিত সন্দিগ্ধ বুনো মেটেলী খরগোসের সঙ্গে। মুখ বুজে পথ চলা বিড়ম্বনা। প্রথমটা কথা বলতে শুরু করেছিলাম। সে ছোট করে জবাব দিচ্ছিল

বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে। পরে বুঝলাম মাথায় বোঝা নিয়ে কথা বলা দায়। আমি গুটিয়ে নিলাম নিজেকে।

পথশ্রমে ওর খোলা উর্ধবাহু, নিটোল কাঁধ, ভরাট পিঠে ঘাম ঝরছে; আলোর ছটায় চিকচিকে, ঠিক যেন ঘি মাখানো কষ্টিপাথরের মূর্তি। দৃঢ় পদক্ষেপের দাপটে নিতম্বের দোলা একই ছাঁদে। একটা সাপিনী, মিশমিশে কালো গোখরো ফণা তুলিয়ে চলেছে আমার আগে আগে, আর অদৃশ্য অজানা এক সম্মোহিনী শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যাত্রার অল্প পরেই ভিন্‌পথ জেনেও শেষে এমনি টান অনুভব করেছি।

সামনে একটা ঝোরা। ও আগের কায়দায় বোঝা নামালো। তরতর করে নেমে গেল জলে। হাত মুখ ধুয়ে আঁচ্‌লা ভরে জল খেল। তারপর হরিণীর মত ছুটে এসে কিছু না বলেই আমার কাঁধের ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে ঘটিটা বের করে নিয়ে আবার জলে নামল। মিহি বালিতে মেজে একঘটি জল ভরে আমাকে তুলে দিল।

হাত মুখের জল মোছেনি; ভিজে পদ্মফুলের মত নিষ্পাপ মুখ। আগে জানতে চেয়েছিলাম ঘাসিরাম কি বলছিল, এখন সে সেই প্রশ্নের জবাব দিল। আমার পরিচয় পেয়ে ঘাসিরাম ভড়কে গিয়ে ওকে কাঠকুড়ানোর সাতদিনের ছাড় দিয়ে দিয়েছে। ঝারাপড়া পয়সা কোনটাই দিতে হবে না।

অবাক হলাম ;—ঝারাপড়া দিতে হয় কেন? আর পয়সা?

অবাক সেও হল। জানাল ; কাঠ নেবে সরকারী বনের পয়সা দেবে না। বিক্রি করে সে ত পয়সা রোজগার করবে। আর কাঠ-কাটার হুকুম পেয়ে বনের ফল ত কুড়িয়ে নেওয়া যায় না। তাই ঝারাপড়া নিয়ে সেগুলো কেড়ে নেয়।

হায় সমাজ ব্যবস্থা, দেশ শাসনের আইন। বনে যাদের বাস, বনের আগাছা, কেন্দপাতা, বুনো ফল, কোনটাতেই তাদের অধিকার

নাই। সব কিছুতেই খাজনা দাও · নয়ত ঘুরপথে পয়সা ছাড়ো, আমার মর্জির কাছে নত হও।

ও কথা বলতে বলতে কাঠের বোঝার উপর মাথার লতার বাঁধন আল্‌গা করে হাত ঢুকিয়ে কি একটা বের করে আঁচলের তলায় গুঁজে আবার বোঝাটা বেঁধে নিল। জলে ধুয়ে যে ফলটা আমার সামনে ধরল জানলাম এর নাম কেন্দা।

মিষ্টি ফল। বনাঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়, সহরে বড় একটা দেখা যায় না। আমার জন্য এত সাবধানে নিয়ে এসেছে। আগে ত জানত না ঝারাপড়া দিতে হবে না। তাহলে আরও নানা জাতের ফল আনতে পারত। পরে এনে দেবে। ফলটা হাতে নিয়ে বলেছিলাম,— বন ত তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা নাই। দরকার কি ঘাসিরামকে জানিয়ে যাওয়ার ; যে কোন পথেই ত ঢুকে পড়তে পারো।

উটা ত চুরি করা হবেক।

নিছক রসিকতার কারণেই হাতের ফলটা দেখিয়ে বললাম— তাহলে এটা।

অঘটন ঘটবে ভাবিনি। মুহূর্তে ফলটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝোরার জলে। এক ঝলক আমার মুখ দেখে নিয়ে, নিজের মুখ নামিয়ে নিল। কালো মেঘের উপর আরেক খণ্ড মেঘের ছায়া পড়েছে। আমি কোনদিন কোন বনবালার চোখে জল দেখিনি। সেদিনও তার চোখে জল ছিল না, কিন্তু দুটো চোখের চাহনিতে মনে হল অপমানে দলিত রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা বুঝি বা ওখানে ভাসছে। আমি হুড়মুড় করে নেমে কাঁচস্বচ্ছ জল হাতড়ে ফলটা উদ্ধার করলাম।

তাড়াহুড়োতে পায়জামার নীচেটা ভিজল। সে ততক্ষণে মাথায় বোঝা তুলে নিয়েছে। তবু কায়দা করে বোঝা সমেত ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে নিল। হাসল কি হাসল না ঠাওর করার আগেই পথচলা শুরু হল।

সবেরই শেষ আছে। এই যে জীবন; সুখদুঃখ, হাসিকান্না, উচ্ছ্বাস বিমর্ষতার পথ ধরে বাল্যকৈশোর যৌবন বার্ধক্য ধাপে ধাপে পেরিয়ে মৃত্যুর অন্তরালে শেষ হয়ে যায়। আর এ ত সামান্য পথ। দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পেয়ে গেলাম পিচঢালা পথ। দূরে সারি সারি খাপ্‌রার চালের মাথা টপ্‌কে গোণা গুণতি পাকা বাড়ী ঘোষণা করছে—রাণীবাঁধ। এখানে থানা আছে, ব্লক অফিস আছে, বন বিভাগের অফিস, আরও ছোটখাট সরকারী অফিসের সঙ্গে জেলা বোর্ডের হাসপাতাল ডাকবাংলো নিয়ে এই তল্লাটের গরবিনী গঞ্জ। ভারত সেবাশ্রম সংঘ আশ্রম পেতেছে, ওদিকে খেরিয়াদের সামাজিক আওতায় আনার প্রয়াসে আবাসিক আশ্রয় গড়ে উঠেছে সরকারী খরচে। এসব পিছনে রেখে আরও এগিয়ে বাঁ হাতের মোরাম বিছানো পথ ধরে বনের ভিতরে বন বাংলো; ঘাসিরামের বড়সাহেব যেখানে ওঠেন। খাপরার চালায় চা তেলে-ভাজা মিষ্টির দোকান, মুদিখানার পাশেই একটা সেলুনে তিন দেওয়াল জুড়ে দেওয়ালপঞ্জীর সুন্দরীরা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। জেলা বোর্ডের ডাকবাংলোটা একটা বেঁটে টিলার উপর। ঐ টিলার পায়ের নীচে পা-ধোয়ানীদের ঝাঁটির বোঝার বাজার। খদ্দের জোটে, পাইকার মুখিয়ে আছে; সবারই এক চেষ্টা কত সস্তায় সওদা করা যায়। ওরা বেশী জিদ ধরতে পারে না, খদ্দের না পেলে পেটের খিদে পেটে নিয়ে বোঝা মাথায় ডুংরিতে ফিরতে হবে। তাই যা পায় তাই নিয়ে চাল কেনে; ইদানীং চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে এককাপ চা খাওয়ার বিলাসিতা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওর মত আরও অনেকে জুটে গিয়েছে। আমি ঝোলা হতে কেন্দ ফলটা বের করে বললাম,—কি ভাবে খেতে হয় এটা।

সকলে হেসে গড়িয়ে আমাকে বোকা বানিয়ে দিল। নিজেদের মধ্যে কথা, মনে হয় আমাকে নিয়েই; নইলে আর সবাই আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছে কেন। সে হাত বাড়ালো। আমি

তিন সত্যি করিয়ে নিলাম আর ফেলে দেবে না। সে গা দুলিয়ে হেসে রাজী হল। দেখিয়ে দিল ধরণটা। জানি না এমনি করেই একদিন শবরী রামচন্দ্রকে ফলাহার করিয়েছিল কিনা।

সওদা শেষে খাবারের দোকানে বসলাম। আমিই যা খরচ করার করলাম। সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিয়েই সে চা খাবার খেল; কোন বিকার নাই, সংকোচের ধার ধারে না।

এটা গঞ্জ এলাকা। বাস থামে, লোকে টুকিটাকি কেনাকাটা করে। ড্রাইভার চা খায়, পান মুখে পুরে পানের বোটার চুন চাটে। কাঁচা শালপাতায় মোড়া আরেকটা পান পকেটে রাখে, পথের খোরাক। মৌজ করে সিগারেট টেনে শেষে গাড়ীতে উঠে শিঙ্গা ফুঁকে জানান দেয়,—কে যাবি আয়, পারের গাড়ী চলবে এবার। বনবালারা চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকে যতক্ষণ না বাসটা গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে পালিয়ে যায়। তখন হুঁশ ফেরে। এ ওর মুখের দিকে চেয়ে অকারণেই হাসির ঢেউ তোলে, ঠাণ্ডা চায়ের তলানিটুকু গলায় ঢেলে পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে দেয় মাটির ভাঁড়।

হাট বসে একটু দূরে, ঝিলিমিলির দিকে যাওয়ার পথে বাঁ হাতে শাল-সেগুনের ছায়ায়। আনাজ হতে শুরু করে মনিহারী জিনিষ কাঁচের চুড়ি রকমারী সব। মাড়োয়ারী এক জাত। ব্যবসা সুবাদে এরা যে কোথায় নেই তাই ভাবি। মাছ আনাজ ছাড়া বাকি দোকান প্রায় সবই ওদের। সাতভোরে বাসের মাথায় মাল তুলে ঠিক পৌছে যায় হাটের দিনে। বাঁধা ঘর কিছু নাই, জায়গা কিন্তু সকলের নির্দিষ্ট। গাছে গাছে দাড় বেঁধে কাপড়ের পর্দা টাঙানো, তার নীচে পসরা সাজানো। হাটের মাঝখানটা টেকো মাথার মত ফাঁকা। সেখানে মোরগ লড়াই। যে যার মোরগ কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে বসে আছে ডাক পাওয়ার আশায়। গুণীনের মুখের পানে বার বার তাকায়। সেই ত ঝাড়ফুঁক করে মোরগের পায়ে ছুরি বেঁধে দেবে।

যার মোরগ প্রতিপক্ষকে খতম করতে পারবে মরা মোরগ তারই। এ লড়াই ওদের রক্তে যেন মিশে আছে। দুই মোরগে ঝটাপটি, আর এঁদেরও উত্তেজনার টগবগানি। মরদের ভীড়ই সেখানে বেশী। মেয়েরা কাঁচের চুড়ির দোকানে, নয়ত শাঁখারীর ছাউনিতে। গালা মাখানো লাল শাঁখা আর রংবাহারী কাচের চুড়ি দুই ওদের মনপসন্দ। সওদা করে পয়সা বাঁচলে হাতের কব্জি খালি থাকলে দুটোর একটায় সেজে তবে ঘরে ফিরবে।

দলছুট হয়ে মজে গিয়েছিলাম মোরগ লড়াই-এ। গুণীনের পাশে দু'পায়ের ফাঁকে ঝোলা গুঁজে উটমুখো হয়ে বসে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম মোরগের পায়ে ছুরি বাঁধার কায়দা। বিড়বিড় করে ধুলো ছিটিয়ে তার গায়ে ফুঁ দেয় বার কয়েক। তারপর দু' হাতে সাপটে ধরে দম নিয়ে আচম্কা ঠেলে দেয় সামনে। রোঁয়া ফুলিয়ে গলা উঁচিয়ে মোরগটা তখন ফোঁসে তাল ঠুকে প্রতিদ্বন্দ্বীকেও ডাকে।

হঠাৎ নেশা ছুটে গেল। কাঁধের উপর হাতের আঁকশির টানে আমি একেবারে ধরাশায়ী। মুখ তুলে দেখি উপরের আকাশের বুকে চাঁদ নয়, পা-খোয়ানীর হাসি ঝিলমিল। লড়াই থামিয়ে সবার নজর আমার দিকে। বুড়ো গুণীন ফোক্‌লা মুখের মাড়ি দেখিয়ে কি বলতেই সে চোখ পাকিয়ে চোপা করল। ভাষা জানি না, মনে হল বুড়ো হয়ত বলতে চেয়েছে রস করে,—নাগর বুঝি। তাই এত ঝাঁজ। ক্ষণিকেই মুখের আদল বদলে যা বলল তার অর্থ নিশ্চয়ই,—দাদার বন্ধু, সম্মানীয় অতিথি। বুড়ো হাত বাড়ালো আমাকে তোলাতে; তার আগেই আমি উঠে পড়ে ধুলো ঝেড়ে নিয়েছি। এবার বন্ধুর দেখা মিলল। হেসে বলল,—আচ্ছা পাগলীর খপ্পরে পড়েছো। এখন ঘর চলো।

যখন বেরিয়েছিলাম তখন আমরা শুধু দুজন। এখন ফেরার পথে পল্লীর প্রায় সবাই। বোঝা-মুক্ত শুধু, পাঞ্চিতে বাঁধা দিনান্তের আহার। রোদের তাপ কমছে, সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। যাওয়ার

সময় বোঝার ভারে, মুখে বোবা চাপে, এখন খই মুড়ি ফুটছে। সকালের লোকসানটা যেন উশুল করে নিচ্ছে। আমি সঙ্গে আছি। তবু যেন নিঃসঙ্গ। ওরা নিজেদের মধ্যে মসগুল, ভাষা বুঝি না তাই আমি চুপ। এত খাটুনি, তবু হাসির ফোয়ারা ছুটছে। বারকয়েক টিপ্পনী ছুঁড়েছে আমাকে, গুঁতো খেতে হয়েছে কনুই-এর। যদি বলি প্রমোদ ভ্রমণ, তাহলে জীবনে এত মন ভরানো আনন্দ আর কোথাও পাইনি। ফিরে আসার আগের দিন বন্ধু কাজে গেল না, আমাকে ঝিলিমিলি ঘুরিয়ে আনল। ওখানের আকর্ষণ শুধু পাহাড়ের বুক চিরে বন্ধুর পথ। কোথাও একপাশে খাড়াই পাহাড়, অন্যপাশে গভীর খাদ। ধাপে ধাপে গাছের মাথার সারি নেমে গিয়েছে অনেক নীচে কোন আদিবাসী ডুংরির দুয়োরে। মানুষ, গরু, ছাগল-গুলোকে পুতুলের মত দেখায়। ঝিলিমিলি হতে কয়েক মাইল হেঁটেছি বনের পথে ওর শ্বশুরবাড়ী পৌছাতে। এক পথে যাওয়া, অন্য পথে বিকালে বাসরাস্তায় ফিরে আসা। এই পথ ওরাই শুধু চেনে জানে। বাইরের লোক নির্ঘাৎ পথ হারিয়ে ফেলবে।

এ যাত্রায়ও আচমকা এক দৃশ্য চোখে পড়েছিল। পা-ধোয়ানীর মুখটা ভেসে উঠল। অনেক কষ্টে শালীনতার খাতিরে কৌতূহল চেপে রেখেছি। লজ্জায় ফেলতে চাইনি তাকে। অথচ ভাবি ঘাসিরামের খাঁকি পোষাকের পাঞ্জাটুকু ছাড়া, তার দৈহিক ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী। হাতে ছিল কাটারি। মুখের আয়নায় প্রচণ্ড প্রতিরোধের ছায়া। অনায়াসে গিরগিটিটার ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে দিতে পারত। তবু কেমন অসহায় ভাব, নির্বিচারে জুলুমটুকু মেনে নিল। পরের আচরণে কোন প্রতিক্রিয়াও দেখিনি। তবে কি তারও সম্মতি ছিল ? অথবা এই এদের জীবনের স্বাভাবিকতা ? হিসাব মেলে না। রেহাই পেয়ে দু'চোখে ঘৃণা উপচে যেভাবে থুতু ছিটিয়েছিল ঘাসিরামের মুখের উপরই এবং কাঠ কুড়িয়ে ফিরে এসে পরে যেরকম স্বাভাবিক আচরণ করেছিল এতে মনে হয়েছে মুল

সূত্রটা অন্য কোথাও বাঁধা আছে, যে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার সাধ্য নেই ওদের। আগে জেনেছি পড়েছি কেতাবে, এদের সঙ্গে কদিন ওঠাবসা করেও বুঝেছি মিথ্যা সতীত্বের কুহকী জালে এদের সমাজ জীবনে অশান্তির বান ডাকে না। তাই বলে স্বেচ্ছাচারিণী ভাবলে অবিচার করা হবে। এ ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র আছে। সভ্য সমাজের মত জুলুমদারীর ব্যাপারটা নেই বললেই চলে, জীবন সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সরল উদার।

বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। সে একনজর দেখেই আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে উলটো পথে বনের গভীরে ঢুকে পড়েছিল; নিশ্চয় আদিবাসী ঐ যুবক যুবতীর অনাবিল আনন্দে বাধা সৃষ্টি করতে চায়নি। পরে বলেছিল,—তোমাদের মত আমাদের চার দেওয়ালের আড়াল নেই। দেখেছ ত আমাদের বাড়ী, একটা ঘরেই সব, সবাই। ওটা ত শুধু রাতের নিরাপদ আশ্রয়, বিশ্রামাগার। বন আমাদের সব। বনকে নিয়েই আমরা বেঁচে আছি বলতে পারো। এই আমাদের ঘর। মন যখন চায়, একজন আরেকজনকে টানে, তখন দুটো প্রাণ হারিয়ে যায় বনের মাঝে, ঝোপঝাড় গাছের আড়ালে। বুকে বুক দিয়ে পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের তাপ নেয় কাজের ফাঁকে, দেহের জ্বালা জুড়ায়। রাত ত নেশার জন্য। মাদল বাজবে, ধামসার আওয়াজে বনের ভারী বাতাস কাঁপবে, শরীর দুলবে, পায়ে পায়ে ছন্দ, কোমরে কোমরে হাত জড়িয়ে গানের সুরে বহুজনের একাত্ম হয়ে রাতের আঁধারকে ছুয়ো দেওয়া। নেচে গেয়ে হেসে দিনের দুঃখ বেদনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত নিরুদ্বিগ্ন মনে ঘুমিয়ে পড়া।

আদিবাসী ছেলে। কেমন করে ছিটকে এই জীবন হতে বেরিয়ে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণর বেড়াজাল টপকে সরকারী বৃত্তির দৌলতে একদিন স্নাতকের তকমা পেয়ে গেলাম আজ ভাবতে বসলে সেই পণ্ডিত মশাইকে মনে পড়ে বারবার। গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলত,—মা

বাবা গিয়েছিল ওদের জমিতে কিরষাণী করতে। সঙ্গে আমি। ছাগল চরানোর বয়সও তখন হয়নি। উঠোনে খামারে ছুটে খেলে বেড়াতাম। উনিই একদিন আমাকে বেঁধে ফেললেন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ধরিয়ে দিয়ে।

সে আফশোষ করে বলেছিল,—লেখাপড়া শিখে দেখছি মনের সরলতা হারিয়ে ফেলছি, অজানা দুঃখবোধ ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি বনেরও রইলাম না, সহরেরও হতে পারলাম না।

পা-ধোয়ানী আর আদিবাসী যুবক যুবতীকে যে ভঙ্গিতে দেখেছি, ওকে সে বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন রাখতেই হেসে জবাব দিয়েছিল,—তোমাদের মত আমরা মেয়েদের নীচে ফেলি না, সমানে সমানে তাল ঠুকি।

এই মুহূর্তে গঙ্গোত্রী হিমবাহ হতে গোমুখীতে যে জলবিন্দুটি ঝরে পড়ল সেটি তিনদিন পাঁচদিন সাতদিন ত্রিশদিন কতদিনে যে সাগর-সঙ্গমে পৌঁছুবে হিসাবটা ঠিক জানা নাই, নদী-বিশ'রদরা নিশ্চয়ই অঙ্ক কষে রেখেছেন। তবে আমি যে ত্রিশটি বসন্ত পিছনে ফেলে আশির দশকে পৌঁচেছি এতে কোন ভুল নেই। আদিবাসী বন্ধুটি এখন শুধুই স্মৃতি। রুজিরোজগারের চাপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কথা নতুন করে মনে পড়ল কিছুদিন আগে রাণীবাঁধ যাওয়ার সুযোগ ঘটায়। অনেক বদলে গিয়েছে গঞ্জটা। বাসগুলো আর কংসাবতীর জল ভেঙ্গে যায় না। মুকুটমণিপুর হয়ে অম্বিকানগর ছুঁয়ে নতুন পথ পেয়েছে সংখ্যায়ও বেড়েছে। যাত্রীদের মানসিকতা তিন দশক আগের মত নাই। আদিবাসীদেরও মুখ খুলেছে, নিজের অধিকার বুঝতে শিখেছে শুধু পোষাকে নয়, মানসিকতায়ও বদলের ছাপ সুস্পষ্ট। ভাল কি মন্দ জানি না। তবে আগের সেই সুরটা যেন নাই। আলো পেয়ে শুধু গঞ্জটা নয় মানুষগুলোও কেমন নতুন নতুন ঠেকল। অথচ, আসার যখন ঠিক হল, ভেবেছিলাম পুরোণ আমেজটা

নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া যাবে। গল্পে মন ভরল না, ডুংরিতে নিশ্চয়ই আশা মিটবে।

পথের নিশানা মনে ছিল। ঠাওর করে মেপেজুপে ঠিক জায়গায় পৌঁছুলাম বটে, কিন্তু হা হতোস্মি : ঘর বাড়ীর কোন চিহ্ন নাই। মাটি গলে, হয়ত পুরোণ ঘরের, এখানে ওখানে গুটি কয় ঢিবি আগাছায় ঢাকা। একবার মনে হল হয়ত ভুল হচ্ছে, এখানে নয়, অন্য কোথাও। ফিরব ভাবছি, হঠাৎ নজর পড়ল নিম গাছটার উপর। অনেকটা গভীর করে বড় ছাঁদে সেখানে 'কু' অক্ষরটি খোদাই করা। আমার বন্ধুর নামের আগ্যাক্ষর। কোন এক সময়ের কীর্তি। মনে পড়েছে এই গাছের নীচে পাতা খাটিয়ায় এসে প্রথম বসেছিলাম। দুটি নাছোড়বান্দা নরম হাত আমার সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে পা ধুইয়ে দিয়েছিল। অতিথি বরণের এই যে তাদের রীতি। চোখের উপর পা-ধোয়ানীর মুখটা ভেসে উঠল। সেই নিটোল নিভাঁজ মুখ। আর তখনই নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গেলাম। আমি ত বন্ধুর অজুহাত নিয়ে আসলে পা ধোয়ানীকেই দেখতে এসেছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম তিন দশক সময় পেরিয়ে এসেছি। আর সেই দেহলতা নেই ; জরার আঁকিবুকি সারা অঙ্গের চামড়ায় বিচিত্র মানচিত্র এঁকে দিয়েছে।

সব হারিয়ে যায়। যে বৃন্তে একবার ফুল ফোটে দ্বিতীয়বার সেখানটা শূন্য। ফিরে যেতে হবে। প্রিয়জন হারানোর মত বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল অজান্তে। বন্ধুর ছোঁয়া তবু ত পেলাম ঐ অক্ষরে : সেই হাটে কেনা পা-ধোয়ানীর দুহাত ভরা কাঁচের চুড়ির একটা ভাঙ্গা টুকরো যদি ঝিলিক দিত এই সময় ; হয়ত মনটা সান্ত্বনা পেত। কিন্তু কোথাও তার ছোঁয়া না পেয়ে নিজের বুকটা কেমন ভেঙ্গে গেল। ফিরব ভাবছি এমন সময়ে তীক্ষ্ণ শব্দে চমকে উঠলাম। মুখে আঙ্গুল পুরে মস্তানি আওয়াজ, যাকে সিটি মারা বলে সেই শব্দ। শব্দমুখো ঘুরতেই দর্শন। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের

ঘর্ষণে টুস্‌কি মেরে আমাকে আহ্বান। দুই পা ত্রিভুজের দুই বাহুর মত বিচ্ছুরিত। পরণের খাঁকি হাফপ্যান্ট ঘাসিরামের উত্তরসূরীর পরিচয় বহন করছে। উর্ধাঙ্গের কুর্তা বোতামের বাঁধুনি হতে মুক্ত থাকায় দুপাশে ডানা মেলে তলার সিল্কের গেঞ্জির 'আপ্‌-পু' ছাপ বিকশিত হয়ে আছে। বাম হাতটি প্যান্টের পকেটের ভিতর। একেবারে সাক্ষাৎ হিন্দী সিনেমার খল নায়ক। এই বুঝি আওয়াজ ওঠে'—তেরা শির পাটক্‌ দে মেরা টেংরিকা পর।

এই সংলাপ আমার নিজস্ব নয়; একদা বন্ধু মহলে শুনেছিলাম। সাপের মত বামহাতটা ধীরে ধীরে গর্ত হতে বেড়িয়ে আসছে। ভগবান জানে চাক্‌কু বা পেটো কার মোকাবিলা করতে হবে এখন। কপাল ঠুকে তার দিকে এগুলাম। না, তার হাতের মুঠোয় সিগারেট প্যাকেট উঠল। একটি বের করে মুখে গুঁজল। ডানার ভিতর হতে হাল আমলের লাইটার তুলে আগুণ জ্বেলে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—ধান্দাটা কিসের মশাই? বলা নাই, কওয়া নাই সরকারী বনে বেআইনী ঘোরাঘুরি।

কৈফিয়ৎ দিতেই হল। শুনে সে যাত্রার নবাবী-হাসি বিলিয়ে জানাল, – ওসব বস্তী কবেই উৎখাত হয়ে গিয়েছে ব্যাটারা গাছ কেটে বন সাফ করে দিচ্ছিল। পরিবেশের একটা ব্যাপার আছে জানেন ত।

মাথা নাড়লাম বিষয়টি নিয়ে আজকাল খুব রমরমা চলছে। আর গাছ কেটে বন সাফ কারা করছে সবাই জানে। অকারণে এদের দায়ভাগী করা। জেনেও প্রতিবাদ করতে সাহস হল না এই অবস্থায়। সে বলল,—বন এলাকা বাড়াতে হবে। তাই বেড়েছে। ওদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওকে কোন রকমে বাগিয়ে নিলাম। জানলাম মাধ্যমিক পাশ। চাকুরীর বাজার চড়া। সংরক্ষিত আসনের দৌলতে এই জুটেছে। মনে মনে বিরক্ত, যোগ্যতা অনুসারে চেয়ার টেবিল না পেয়ে লাঠি হাতে কাঠ চোর তাড়ানো। কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে সভ্য হয়েছে;

এখন ত আর নেংটি পরে ক্ষেতখামার বনে কোদাল কাটারি নিয়ে নামা যায় না। রাতরায় সিনেমা হল জমে উঠেছে সুযোগ পেলেই সেখানে হাজিরা দেয়। পর্দার গন্ধর্ব অপ্সরারা শয়নে স্বপনে জাগরণে চোখের সামনে ভাসে। মন চায় অমনটি হওয়ার। হতে না পারায় হতাশায় ভুগছে। বনের গাছগাছালিকেই নিজের প্রেম দেখায়, ভঙ্গিমায় ও বাচনে।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,—চমৎকার।

মনে মনে বললাম, –একেই হয়ত বলে অন্ধকার হতে আলোয় উত্তরণ, যার নাম সভ্যতা।

শুধাল, –কি চমৎকার?

মিথ্যা বললাম,—এই বন, কত বাহারি গাছ. পাতা আর ফুলে রং এর খেলা, পাখির ডাক, আহা মনটা জুড়িয়ে যায়।

ওর একটা চোখ ছোট হয়ে গেল, আপনি ত মশাই কবি মনে হচ্ছে। ওসব কাগজে কলমেই ভাল। সাতদিন থাকুন এই বনে। কাব্য ছুটে যাবে, লাইফ হেল করে দেবে।

ওর হাত হতে ছাড়া পেয়ে ফেরার পথে ওর শেষ কথাটাই তোলপাড় করছিল। লাইফ হেল করে দেবে, অর্থাৎ নরক যন্ত্রণার সামিল হবে। হয়ত হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে বন হতে যারা উৎখাত হয়েছে, ঘরে সবকিছু বাড়ন্ত হওয়া সত্ত্বেও যারা আজ খেয়ে আগামী-কালের ভাবনায় কুঁকড়ে না থেকে প্রাণখোলা হাসতে পারত, তারা হয়ত একমুঠো ভাতের আশায় বন ছেড়ে সভ্যতার নাগপাশে জড়ানো সহরমুখো হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে।

আজ তিন দশক পরে বন্ধুর কথাটা বার বার মনে পড়ছে। জানি না সে ত্রিকালদর্শী ছিল কি না। কিন্তু তার সেদিনের ভাবনার সঙ্গে আজ অনেক কিছুর মিল খুঁজে পাচ্ছি। সেদিন ঝিলিমিলি হতে ফেরার পথে বন্ধুর যেন ঘোর লেগেছিল। কোন প্রশ্নর অপেক্ষা রাখেনি, আপন মনেই বকবক করেছিল।

ছাখো, দেশে ত কোটি কোটি মানুষ। আমরা বনের মানুষ আর কতজন। বনের খেয়ে, নদী ঝোর জলা জায়গার আশপাশ হাসিল করে জোয়ার ভুট্টো ধান কোন শাক সব জি ফলিয়ে বেশ ত বেঁচে আছি। কেন্দপাতা, মহুয়া, হরিতকি, বহড়া, আমলকি, শালবীজ কুড়িয়ে হাটে বেচে যা পেতাম তাতেই একরকম পেট চলে যায়। আমরা আমাদের মত থাকতাম। কি দরকার ছিল আমাদের হাসিল করা ক্ষেত-খামার, ভুমি-সত্ব আইনের দোহাই দিয়ে কেড়ে নেওয়ার, বন বাঁচানোর অজুহাতে অফিস করে পাহারাদার বসিয়ে বনবাসীদের বন হতে উৎখাত করার। আমরা চোর নই ; গাছ আমাদের প্রাণ, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কাটি। চুরি ত করে সহরের মানুষ। তারা লোক নিয়ে আসে, নির্বিচারে গাছ কাটে, দরকারে টাকা ঢালে, লরি বোঝাই করে চালান দেয় সভ্যতার সৌখিন ইমারত আসবাবের চাহিদা মেটাতে। দোষী হই আমরা। ভাল বিচার। সভ্যতা নামক এই যে অদ্ভুত আরক, এ তোমরা খাচ্ছ খাও, আমাদের টানছ কেন। এই ত রাইপুর সারেঙ্গায় সাত সমুদ্র তেবো নদী পেরিয়ে পাদ্রীরা এসে হাজির। কি ব্যাপার? না, মানুষের সেবা করব। সেবা করাব ঠাঁই জুটল না এতবড় পৃথিবীতে। ঢুকতে হল গভীর বনে বনবাসীর খোঁজে। ওখানে চোখ ধাঁধানো হাসপাতাল, যা অনেক সহরেও নাই। আমরা কি এতই অসুস্থ, রুগ্ন, স্বাস্থ্যহীন যে চিকিৎসার এই আয়োজন? নাকি আমাদের চমকে দেওয়ার চেষ্টা? ভাল কথা, সেবা করতে চাইছো সেবা করো, কিন্তু তার আড়ালে তোমার ধর্ম আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কেন। আমার লৌকিক দেবদেবী আর ধর্ম বিশ্বাসকে ত্যাগ করে তোমার উপাস্যকে আঁকড়ে ধরলেই তরতরিয়ে বৈতরণী পার হয়ে সভ্যতার উগ্র রোশনাই ছড়ানো মঞ্চে আসীন হবো? গিয়ে ছাখো, যারা তাই বিশ্বাস করেছে ওরা গির্জায় যাচ্ছে, আবার করম বাদ্না পরবে উৎসব করছে। এসেছে ত ওরা অনেক কাল। কতজন বনবাসী তার গণ্ডী পেরিয়ে তোমাদের

সমকক্ষ হতে পেরেছে। আর অগ্রগতির দোহাই দিয়ে আমাদের আর সব সংস্কার রীতিনীতিকে কুসংস্কার আখ্যা দিয়ে সভ্য শিক্ষিত করে তোলার নামে কিছু বিদ্যালয় আর মাসোহারা দিয়ে অক্ষর-জ্ঞানের তালিকা বড় করলেই আমরা উঠে পড়তে পারবো উপরে? জানি না। তবে ইতিমধ্যেই ত দেখছি আমাদের কিছু মেয়েরা তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে না পারছে আর এগুতে বা প্রতিষ্ঠা পেতে, না পারছে পুরোণ কাঠামোয় ঘর-সংসার পেতে ক্ষেত-খামারে কাজ করার মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। আমাদের যা ছিল না, বিরাট একটা স্বপ্ন দেখার মন, ওরা কিশোর বয়স হতে এই পরিবেশের দরুণ তাই আহরণ করে নতুন যন্ত্রণায় ভুগছে। বলতে পারো আমাদেরই একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে। ছেলেরাও তাই; অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। এরা আর নেংটি পরে না, দৈহিক শ্রম করতে নারাজ, ঐ সভ্য সমাজের খারাপ দিকগুলো আশ্রয় করে বেঁচে থাকার পথ খোঁজে। এরাই দিনে দিনে হয়ে উঠছে বিপদজনক; একটা নব্য দালাল গোষ্ঠীর উদ্ভব। বন-বাসীদের প্রতারণা করে তাদের সুখসুবিধা বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে ভাঙিয়ে ফায়দা তুলছে। এমন একজনকে ত দেখেছো রাণীবাঁধের বাজারে। অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যে। শুনেছি তালে আছে এম. এল. এ. হওয়ার। যারা সত্যিই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গোত্রীয়। উপায় নেই তাই উপাধি আঁকড়ে ওটা ভাঙিয়ে আরও উপরে ওঠার চেষ্টায় আছে। নীচের দিকে কেউ ফিরেও তাকাতে চায় না। দু'চারজন অবশ্য নানা ধরণের ক্ষোভ তিতিক্ষায় ভুগছে। আমার কথাই ধরো: না ঘরকা না ঘাটকা। নেংটি পরে কাঠ কাটতেও চাইছি, আবার প্যান্টসার্ট পরে চেয়ার টেবিল নিয়ে রুজি রোজগারও করছি। সত্যি বলতে কি কোনটাতেই সুখশান্তি পাচ্ছি না। এই অশান্তির ভোগান্তিটা উপরি পাওনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বনে যেমন গাছ থাকবে, বন্যজন্তু থাকবে, তেমনি

বনবাসীদেরও সেখানে প্রয়োজন। আমার ত মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। এটা শ্রেণীবৈষম্যে মদত দেওয়া ভাবলে ভুল হবে। এই ত ছাখো না, চাষের মরশুমে নাবাল দেশে পেটের ভুখা মেটাতে এরা দলে দলে ঘর ছাড়ে। কাজ শেষে আবার ঘরে ফিরে বননির্ভর হয়। বছরে বছরে এদের দল ভারী হচ্ছে শুধু কি ভুখার কারণে? আমি কলেজে পড়ার সময় হতে লক্ষ্য করছি। বনে যত তাড়া খাচ্ছে নজর পড়ছে বাইরের দিকে। বাইরে যারা যাচ্ছে ফিরে এসে নতুন হাওয়া তুলছে অজানা সুখের, স্বপ্ন পরিবেশের। অন্যজনের নেশা ধরছে। অতএব চলো নাবালে, ক'মাসের জন্য নতুন সুখটা চেখে দেখে আসি। সচ্ছল গ্রামের বাতাসে, আসা যাওয়ার পথে ছোট বড় সহরের হাতছানিতে টালমাটাল অবস্থা; ফেরে মনের রং বদল করে একটা স্বপ্ন নিয়ে। এরা সততা মেনে চলে, কাজে ফাঁকি দেয় না, ফসলের হেরফের করে না; এক কথায় চোরজোচ্চোর নয়। ফলে জোতদারের লাভ। চাহিদা কম, উশুল বেশী। এমন মওকা কে ছাড়ে। এরা কাজ করে নিষ্ঠার সঙ্গে, কপাল ভাল হলে আশে-পাশে সিনেমা সার্কাসের তাঁবু পড়লে অদ্ভুত কিছু ছাখে। হাট-বাজারে নিত্য নতুন প্রসাধনীর জৌলুসে মন হারায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সায় তাই কিনে বিগলিত হয়। অন্যদিকে বয়স যদি কাঁচা হয়, টগবগে ভাব থাকে, গ্রাম সহরের রাজপুত্তুরে মজে যায়। কি আছে এমন; দু' দিনের দিল্লাগী উপরিপাওনা। একটা জামা-শাড়ী বা গিল্টি সোনার কানের গলার গয়না দারুণ কিছু। অতএব মজে যাও, জমে যাও। তোমাদের কৃষ্ণর বাঁশিতে ত হাজার গোপিনীর উথালি-পাথালি। আর গঞ্জে সহরে হাজার কৃষ্ণর টাকার ঝন্‌ঝন্। অভাবী মানুষ, জৌলুসে চোখে ধাঁধা; জালে ত পড়বেই। আর পরিণতি যা হওয়ার হবে। পেটে কার বাচ্চা নিয়ে গাঁয়ে ফিরলো ঘরের মানুষ গাঁয়ের মোড়ল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফল ফলতে শুরু করেছে, নতুন প্রজন্মে দেহের গঠন, মুখের ছাঁদ, গায়ের

রংএ স্বতন্ত্র ধারা ফুটে উঠছে। দেখবে সভ্যতার কুহকে একদিন বনবাসীরা হারিয়ে যাবে, মুছে যাবে তাদের বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য স্বাতন্ত্র।

তিন দশক পরে আজ বারংবার দুঃস্বপ্নের মত বৃদ্ধ নিমগাছের বুকে খোদাই করা বন্ধুর নামের আদ্যাক্ষর 'কু' চোখে পড়ছে। তার পুরো নামটা উহ্য থাক, কিন্তু এই অক্ষরটা ভাল কিছু ত ইংগিত করে না। কুটিল, কুহক, কুশ্রী ইত্যাদি মনোভাবগুলো প্রকাশ করে ব্যর্থ আক্রোশে বনবাসীদের কাছে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিল কিনা সে বলতে পারত। আবার নিছক ছেলেমানুষীও হতে পারে, যদিও প্রথমবার ঐ খোদাই ছিল না।

ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে একবার একজন সাধু এসেছিল। কিসে কি ঘটে গেল, হঠাৎ খুব নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। পরিত্যক্ত একটা মন্দিরের ঝোপঝাড় সাফ করে সেখানে সেই উপলক্ষ্যে দিনরাত সংকীর্তন অষ্টপ্রহর।

মহোৎসবের চাল ডাল আনাজ কোথা হতে আসছে কে জানে। ভক্তরা বলে,—বাবার ইচ্ছা। তিনি চাইছেন, চলে আসছে।

বিরাট কৌতূহল নিয়ে কনুই এর গুঁতো মেরে একদিন মুখোমুখী হলাম সেই বাবাজীর। সাদামাঠা চেহারায় বিরাট জটা, থুতুনীতে ছাগল দাড়ি মাত্র। রসকলি কপাল নাসিকায় শোভিত। গলদেশে তুলসীর কণ্ঠী। পরণে সাদা থান অনেকক্ষণ বসে আছি। হঠাৎ উনি আমার মাথা স্পর্শ করতে ধন্য হয়ে গেলাম। চমক লাগল। বলে ফেললাম,—আপনি ভগবানকে দেখেছেন ?

উত্তর পেলাম,—চোখ থাকলেই দেখা যায় বাবা।

সেদিন সেকথার অর্থ বুঝিনি। এখন বুঝি। চোখ থাকলেই হয় না, দেখার ক্ষমতা আয়ত্ব করতে হয়।

বিরাট প্রত্যাশায় ছেলেমানুষী মন নিয়ে বনে এসেছিলাম ; ফিরে এলাম হতাশা নিয়ে রাণীবাঁধে।

নিজেকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মনে হল। বাস পেতে দেরী আছে।

একটা খাবারের দোকানে ঢুকলাম। সহরের মত ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চারপাশে চারটে চেয়ার। ঢোকার মুখে বড় মাটির জালায় গলা জড়িয়ে প্ল্যাসটিকের মগ। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা। হুকুম জাহির করে একটা চেয়ার দখল করলাম। ভিড় বেশী নেই, ওটা বোধহয় বাস আসা যাওয়ার সময় বুঝে হয়। কাপপ্লেট আছে, আবার কাঁচা শালপাতা মাটির ভাঁড়। অবসন্ন চোখের দৃষ্টি ছিল উদাস। হঠাৎ হাসির ঝলকে টনক নড়ল। কোণের দিকে একটা টেবিল ঘিরে তিন তরুণী এক যুবক। সবারই কাঁধের ঝোলা মাটি ছুঁই ছুঁই। দেখে মনে হয় ছাত্রছাত্রী; সম্ভবত উচ্চ মাধ্যমিক অথবা কলেজের। হালে ত কলেজ হয়েছে খাতরায়। কে বলবে আদিবাসী যদি না তাদের আলাপচারীর ভাষা কানে বাজে। পাঞ্চি পাঁড়হাড় নাই; একালের মত ব্লাউজ, শাড়ী পরার ঢং। পাতলা জামা ভেদ করে অন্তর্বাসের ছাপ। তেলহীন চুল রিবণ দিয়ে জড়ানো ঘাড়ের কাছে। কপালের উপর কুচোচুলের লুকোচুরি. যেন কালো গোলাপের গন্ধে মাতাল কালো ভ্রমরের পাখা ঝাপ্‌টানি। ছোকরার পরণে আঁটসাট প্যাণ্ট, টেরিলিন সার্ট। একনাগাড়ে বকবকম। মাঝে মধ্যে বাংলা ইংরাজী শব্দের ফোড়ণ। খাবো কি, ওদের দেখে ভাঙ্গা মন জোড়া লেগে গিয়েছে। গুণগুণিয়ে স্বাগত ভাষণ,—আহা বেশ, বেশ। আলোর দরকার ছিল, আলো জ্বলেছে সত্যিই। অন্ধকার হতে ওরা বেরিয়ে পড়তে পেরেছে। এখন ত শেখার পালা; সাঙ্গ হলে তখন বাস্তবের মুখোমুখি; রুজিরোজগার, ঘর সংসার, ভূত ভবিষ্যৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা হাতে; কায়িক শ্রম নয়, চেয়ার টেবিল ফাইল টেলিফোন চাই। অতএব লাইন লাগাও কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে। সত্যই আমরা এগিয়ে চলেছি, বনবাসীদেরও টেনে তুলতে পেরেছি। আবার কি চাই।

তবু যেন কিন্তু থাকে। অন্ধকারে আলো জ্বাললে পতঙ্গ মোহাচ্ছন্ন হয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়।

ওরা কব্জি ঘড়ি দেখে উঠে পড়ল। আরেক নজর চোখ বুলিয়ে নিলাম। পোষাকে প্রসাধনে চালচলনে এমন কি গায়ের রং মুখের আদলে কে বলবে এদের পূর্বপুরুষ ছিল বনবাসী, আমাদের দৃষ্টিতে বন্য অসভ্য। মাত্র তিন দশকেই কত বদল।

দোকানী হাঁক ছাড়ল,—ও মশাই বাঁকুড়ার বাস আসছে।

পয়সা মিটিয়ে বনমোরগের মত ছুট দিয়ে ধরলাম তাকে। বসার জায়গা পেলাম। কে জানত এখানেও সিটে ছারপোকার উৎপাত। সবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছি, এমন সময় কর্ণকুহরে মধুর ধ্বনি,—এটা লেডিজ সিট।

ঘাড় তুলে দেখি খাবারের দোকানের ওরা। চোখে মিটিমিটি দুষ্টু হাসি। সঙ্গত অধিকার, এ সোনার তরীতে পারাণি দিলেও পা রাখা যায় না। উঠতে হল। ওরা হয়ত জয়ের আনন্দে খিলখিলিয়ে আমাকে গোঁত্তা মেরে বসে পড়ল। এ ত হাসি নয় হুল। লজ্জায় নেমে পড়লাম পথে। কোথায় আছি; বন ঘেরা রাণীবাঁধে না ইট কাঠ পাথর ঘেরা যন্ত্রসভ্যতার কোন সহরে। আবার স্বগতোক্তি,—এই ত ঠিক ঠিক অগ্রগতি।

বাসের ধুলো গিলে গাছতলায় সারসের মত একা দাঁড়িয়ে রইলাম। এমনি থাকতে হবে এক ঘণ্টা, পরের বাসের জন্য; অতএব নিজেকে সান্ত্বনা দিতে ধূমপানে মনোনিবেশ।

একটু পরে আওয়াজ উঠল অনেক কণ্ঠে। এদিক ওদিক হতে উঁকিঝুঁকি। ঝিলিমিলির দিক হতে একটা মিছিল এগিয়ে আসছে। একটা শব্দ বুঝতে পারছি—ঝাড়খণ্ড। মিছিলটা আমাকে পেরিয়ে বাঁয়ে ব্লক অফিসের দিকে ঘুরল। সামনের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধোপদুরস্ত, চেহারায় পোষাকে চিক্‌নাই। বাকিরা খেটেখাওয়া মানুষ। নেংটি নয়ত গামছা, উদোম গা; মেয়েদের পাছি পাঁড়হাড্, বাড়তির মধ্যে সবার অঙ্গে ব্লাউজ। একজন পথচলতি লোকের কাছে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা। বলল,—দেশ ত এগিয়ে

চলেছে। ওরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন। ওদেরও আলাদা রাজ্য চাই।

মনে মনে বললাম,—সত্যিই ত। ছিল ঘুম ঘোরে, জেগে উঠে দাবী ত জানাবেই। এও সামনে চলার নতুন পথ, যার নাম রাজনীতি।

মেয়েগুলো ভালই করেছিল আমাকে বাস হতে নেমে পড়ার সুযোগ দিয়ে। নইলে এত অগ্রগতি দেখতে পেতাম না।

দেখেশুনে বার বার বন্ধুর কথাগুলোই মনে পড়ছিল। বাবাজীর কথায় চোখ যেন সব নতুনভাবে দেখছে এখন। রাণীবাঁধ হতে ফিরেও সে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে দিইনি। তৃতীয় নয়ন নিয়ে ঘুরেছি। ইদানিং যত্রতত্র আদিবাসীদের সাক্ষাৎ মেলে ; যেখানে কাজ, সেখানেই ওরা। কর্মঠ এই সুবাদ এখনও রয়েছে এদের।

ত্রিশ বছরে অন্ততঃ একাধিক প্রজন্মর আবির্ভাব ঘটেছে। একদা যারা ছিল মরশুমী ক্ষেতমজুর, এখন তাদের বিরাট একটা অংশ স্থায়ী ঘর বেঁধেছে লালমাটির এলাকা ছেড়ে বেলে দোঁআশ এঁটেল মাটির গ্রামেগঞ্জে সহরে। উপচে পড়েছে কলকারখানায়, ইটভাটায়, ঠিকাদরের নানা কাজের ছাউনিতে। ঐ যে রাক্ষুসে লরীর মাথায় চেপে খোঁপায় জবাফুল গোঁজা ব্লাউজ ব্রা সায়ার উপর সিনথেটিক শাড়ী প্যাঁচানো কামিনছুটো কুলিগুলোর সঙ্গে রঙ্গ করে নাকিসুরে রব তুলে চলেছে হেসে নেচে ; তাদের মুখের আদল, গানের সুর, হাসির ধরনে কোথাও খুঁজে পেলাম না আমার পা-ধোয়ানীকে। বাইরে হতে সব প্রায় একই রকম, কিন্তু প্রাণের ছোঁয়া নেই ; পুতুল আর বিগ্রহের মত তফাৎ। পাকাসড়কে স্টিমরোলারের আগে পিছে যারা পাথর কুচির ঝুড়ি মাথায় ছুটছে, তাদের মধ্যেও পাইনি তাকে। পাইনি জোতদারের খামারবাড়ীতে যারা ধানঝাড়াই মেসিনে নিবিষ্টমনে ধান ঝাড়ছে তাদের সঙ্গে। মিলের বিরাট উঠোনে যারা সার বেঁধে ভিজে ধান পায়ে পায়ে উলটে দিতে দিতে

পুরানো নেশায় গান গাইছে, তারা পা-ধোয়ানীর পরবর্তী প্রজন্মের সত্য; কিন্তু আমার দেখা পা ধোয়ানী নয়। বর্ধিষ্ণু গ্রামের প্রান্তে দিঘীর চার পাশে যে বসতি গড়ে উঠেছে সরকারী পাট্টার দৌলতে কয়েক বছরে, যেখানে আজও মাঝে মাঝে নিশুতি রাত পর্যন্ত মাদলে বোল ওঠে হারমনিয়মের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, বাজনার তালে শরীর দোলে স্বকীয় ছাঁদে হিন্দী সিনেমার কোমর ঝাঁকানি মিশিয়ে, সেখানেও নাই সে।

কি করে থাকবে। ওরা আর পা-ধোয়ানী, মনের দিক হতে যে ত্রিশ বছরের দূরত্বে। আজও যারা মরশুমী হয়ে আসা-যাওয়া করে প্ল্যাসটিকের ব্যাগে জামাকাপড় গুছিয়ে, ধানকাটা সারা হলে বর্ধমান স্টেশনে নেমে বাস ধরতে হয় বুনো পাহাড়ের কোলে পৌছুতে; তারা ইদানীং সঙ্গে দুচারটে পড়তি বয়সী প্রৌঢ়াকে নিয়ে আসে যাদের কাজ ছেলে ধরা, কাজের সময় রান্নার জোগান ঠিক রাখা, বাসে হুড়মুড়িয়ে জায়গা দখল করে সামান সাজিয়ে নেওয়া হলে সেগুলো পাহারা দেওয়া। আর এরা? দল বেঁধে সেজেগুজে ঢুকে পড়ে স্টেশনের বগলে সিনেমা হলের দুপুরের শোতে। হিন্দী, ইংরাজী, বাংলা বাদবিচার নাই; ছবিতে কথা বলবে, নাচবে গাইবে কাঁদবে হাসবে চলবে ফিরবে এতেই আনন্দ। মনকে ভরিয়ে রাখতে চায়। আবার তো সেই ডুংরির দিনরাত। পা-ধোয়ানী তো এসব দেখেনি, নিজের ছবিই দেখেনি; যা দেখেছে ঝাপ্সা আয়নায় অথবা ঝোরার জলে নিজের মুখ। তাই সিনেমার আনন্দ লুঠেরাদের মাঝেও তাকে পাই না।

বন হতে বেরিয়ে লালমাটির উচ্চাবচ অঞ্চল পেরিয়ে নদীমাতৃক উর্বর মাটির বুকে ওরা যারা এসে ঘর বেঁধেছে এবং এখানে ভবিষ্যতে চলে আসবে, বুঝে নিয়েছি, তাদের মাঝে আর কোনদিন তাকে পাবো না। ওদের যে প্রজন্ম সময়ের তালে বিলীন হয়ে গিয়েছে সে চলে গিয়েছে তাদেরই সঙ্গে। এরা নতুন; আলোয় আলোকিত, সভ্যতার স্বাদ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

আর কোনদিন দেখা পাবো না পা-ধোয়ানীর, যার সারল্যভরা উদ্দাম যৌবন আমার ক্ষণিকের দয়িতা, যার উষ্ণ মনের স্পর্শ আমার মায়ের চকিত উপস্থিতিব উপলব্ধিতে জননী, সে আর নেই।

আমার ছাত্রজীবনে উপনয়ণে বাবার দেওয়া ঝরণা কলমটা হারিয়ে খুব কেঁদেছিলাম ; আজ পা-ধোয়ানীর জন্য আমার তেমনি কাঁদতে ইচ্ছা জাগল।

দোষ দিলে ঘাট মানতেই হবে। শুরু হয়েছে অপ্সরা উর্বশীর বিবর্তনের পথ পরিক্রমা আর কোথায় একালের কে এক হারিয়ে যাওয়া পা-ধোয়ানীর জন্য হা পিত্যেশ। পুরানো কাহিনী নিয়ে নাড়াচড়া করতে গেলে এখানেই মুস্কিল। তাই ত আগেই বলেছি এ হল গুরুমুখীবিদ্যা। গুরু ধর, ঠিক পথ ধরিয়ে দেবে। পাঁকে পংকজের আত্মপ্রকাশ, তবু তা পবিত্র, লক্ষীর হাতে তার স্থান। মাথায় ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন্য মানুষের জীবনযাত্রার কল্পচিত্র। সেই পটভূমিকায় ভেসে উঠল পা-ধোয়ানীর মুখ। এও সেই গুরুমুখী কায়দা। যে জন বিজ্ঞ তিনি ঠিক বুঝবেন কার্য্য-কারণ। খোলশা করেও বলতে মানা, আমি নাচার। তবু খুব জুলুম করলে এইটুকু শুধু বলতে পারি।

তীক্ষ্ণ আওয়াজে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। খোলা দরজায় গঙ্গার বুকে ভেসে উঠল একটা ষ্টীমার। জল কেটে এগিয়ে যাওয়ার শব্দের সঙ্গে জেলে নৌকার মাঝিকে সতর্ক করা ভোঁ শুনে হাল বাস্তবে ফিরে এলাম। তাই ত। বসে আছি একালের উর্বশীর অজ্ঞাতবাসের প্রাসাদে বৈঠকখানায়। দরজার ফোঁকরটুকু পার হতেই যেন হাঁপিয়ে উঠছে ষ্টিমারটা। যত গর্জন, তার বহুগুণ কম গতি। অথচ মন। মানুষের ছোট্ট খাঁচাটুকুতে বাস। নির্বাক অথচ নক্ষত্রর গতি, বুঝি বা তার চেয়েও বেশী। নইলে কতক্ষণই বা ওরা ভিতরে গিয়েছে

আমি একলা বসে এখানে। অথচ কতদূর ঘুরে এলাম এরই মধ্যে; কত কিছু মনের চোখ দিয়ে দেখা হয়ে গেল এক ঝলকে। ছিঁড়ে যাওয়া ছবিটা হতে মুহূর্তে পা-ধোয়ানীর হাসি মুখ ভেসে উঠল। হারিয়ে গিয়েছে ভাবতেই অনুভব করলাম চোখের পাতা ভারী হয়ে আছে। একটু চাপ পড়লেই অজানা জমাট বেদনা গলে জল হয়ে গড়িয়ে পড়বে। কেউ দেখে ফেললে, বিশেষ করে ওরা, লজ্জায় পড়ব। তাড়াতাড়ি হাতের চেটোয় ঘষে ঝাপসা পর্দাটা সরাতেই সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল উর্দিপরা মানুষটা। জানতে চাইল কিছু খাবো কিনা। লেবু-চা হলে ভাল হয়। জানিয়ে আমার প্রশ্ন রাখলাম ওরা কি করছে। ভাবলেশহীন জবাব,—পিতা হ্যায়।

দেরী হবে?

মালুম নেহি জী।

বনিয়াদী খিদমদগার ফিটফাট পোষাক, নিঃশব্দ চলাফেরা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, মাপজোপা কথাবার্তা।

চা এলো। একা জমে না, ওকেও চাই এক্ষেত্রে। সেই কবে যৌবনের প্রাক্‌লগ্নে খোকাত্ব হতে পরিত্রাণ পেতে তাকে ঠোঁটে তুলেছিলাম, পরিশেষে নিঃসঙ্গতার বিশ্বস্ত সঙ্গী, অস্থিরতায় ভরসাদাতা হয়ে উঠল। আমি বড় হয়েছি এটুকু জাহির করতে ওর সাহায্য নিয়েছি তার খেসারৎ দিতে আজ আমি তার দাস। হৃৎপিণ্ডে কর্কটের কামড়, ডাক্তারের সাবধান বাণী সব তুচ্ছ। তাকে ছাড়তে পারিনি। সে এখনও আমার বড় অবলম্বন। অতএব পকেটে হাত চলে গেল। ওর মুখে আগুন দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছড়াতেই মনের নড়াচড়া টের পেলাম।

প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে একালের উর্বশী 'পণ্যা' শব্দটি উচ্চারণ করেছে কেন? এত জানতেন, জ্ঞানের গভীরতা সত্ত্বেও কবিগুরু পৌরাণিক সব কাহিনী উপেক্ষা করে সেকালের উর্বশীকে পিতৃহীনা

স্বামীহীনা, মাতৃত্বে বঞ্চিতা একটি সত্তা হিসাবে চিত্রায়িত করলেন। এখানেও 'কেন' শব্দটি মাথাচাড়া দেয়।

মানুষ আদিম অবস্থা হতে ধীরে ধীরে সভ্যতার আলোয় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। এখনও তার ক্লান্তিহীন বিরামহীন এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা।

সত্যিই কি কয়েক হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে আমরা আলোয় এসে পৌচেছি? বাস্তবে ত দেখি এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় বিজ্ঞানের নানা আবিস্কার অধিকাংশই ঘটেছে আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনা জনিত অথবা বিশেষ কোন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। অঘটনই জন্ম দিয়েছে ঘটনার।

স্বপ্ন দেখছিলাম হয়ত; দিবাস্বপ্ন। অথবা মনের সঙ্গে খেলা, যে এই এখানে এই ওখানে। নইলে কোথায় আদিম যুগের এক মানবী, একালের ভাষায় বনদেবী সমা, একপাল মেষ নিয়ে মাতামাতি করছে; তাই দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বাস্তবের পা-ধোয়ানীর জন্য চোখ ভার। কল্প-ভেলায় এক লহমায় নক্ষত্র হতে নক্ষত্রান্তরে যাওয়ার সম্পূর্ণ দৃশ্য ফুটে ওঠে; তার বিবরণ ভাষায় বিবৃত করতে গেলে ঘণ্টা, দিন, এমনকি মাস কেটে যায়। বিবরণ দীর্ঘ, দর্শন ক্ষণিকের।

গুছিয়ে নিয়ে মনকে আলগা দিলাম। ঐ ত আমাকে ঘোরাচ্ছে আদিমতম মানবগোষ্ঠীতে। ওদের দেখা ত শেষ হয়নি এখনও। দেখতে হবে, জানতে হবে স্বকীয় সত্বা হতে মানবী কেমন করে পণ্যা হল। অতএব ফিরে যেতে হয় তার কাছে।

সেই আদিম নেত্রী; হঠাৎ যার মনোবৈকল্য ঘটল একপাল মেষশাবক নিয়ে, সেদিন সে নতুন এক জীবনযাত্রার শুরু করেছিল নিশ্চয়ই।

কি যে হল তার, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এলোমেলো হয়ে গেল। স্বাস্থ্যবান নধরকান্তি এগুলো ভোজ্যবস্তু হাতের মুঠোয়

থাকা সত্ত্বেও পাথরের কুঠার কোনো আঘাত হানতে পারল না। দলের লোক ছটফট করে; ক্ষুধায়, লালসায়, হিংস্রতায়; তবু নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। বিদ্রোহ করার কূটচাল তখনও তারা আয়ত্ব করেনি। ফলে কদিন গাছের ফল আর মূলকন্দ খেয়েই কাটাল। ওদিকে এক স্ত্রী-মেষের তিনটি বাচ্চা হল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একটা মরল। নতুন বোধ জাগছে। সেই মৃত মেষটি ঝলসানোর আগে বেশ যত্ন করে আনাড়ি হাতে লোমশ চামড়াটা ছাড়িয়ে নিল। যেন নেশায় পেয়েছে তাকে। নিজেকেও মেষ হিসাবে ভাবতে ইচ্ছা হল। নিজের বরাঙ্গে নেত্রী সেই কাঁচা লোমশ চামড়াটা তুলে নিল। আয়তনে ছোট; টানা-টানি করে শেষে লতার বাঁধনে কোমর হতে ঝুলিয়ে দিল। বিস্ময়ে বার বার হাত বুলায় নরম লোমের উপর। তারপর হেসে খানখান; বলা যায় বন্য মানবীর হিংস্রতার মধ্যেও চিকন নতুন এক অভিব্যক্তি। কোকিল ডাকে বারোমাস, তবু বসন্তে তার কণ্ঠ হয় মধুময়। এও যেন তাই। আদিম কোন এক কালে সেই প্রথম মানুষের অঙ্গে উঠেছিল আবরণ।

সে দেখল সদ্যজাত শিশুগুলো গর্ভধারিনীর স্তন্যপান করছে। কি খেয়াল হল হঠাৎ স্ত্রী-মেষটির পিছনের পা দুটো ধরে খাড়া করে তুলে ধরে নিজেই কিছুক্ষণ চুষে দেখল। সেই নতুন কিছু পাওয়ার উচ্ছ্বাস। কলস্বরে দলের সবাইকে জানালো তার অভিজ্ঞতার কথা। পালা করে সবাই এক আধবার তেমনি ভাবে দুধের স্বাদ নিল। হাত দুলিয়ে সুস্বাদের অভিব্যক্তি করল।

আরেক দিন। নেত্রীর চোখে পড়ল দুটি মেষের মিলন দৃশ্য। স্ত্রী-মেষের শিংদুটোর বাঁক অন্যগুলি হতে স্বতন্ত্র ছিল। ফলে একনজরে সেটিকে চেনা যায়।

মেষগুলিকে নিয়ে ওরা নাবাল জমিতে যায় খাওয়াতে, জলায় নামায় জল খেতে। ঐ পশুগুলোকে নিয়ে দলটা মেতে রইল,

অনেকটা স্থিতি হয়ে গেল সেই বটতলায় নেত্রীর খামখেয়ালীপনায়। নেত্রী কেমন যেন নির্বিকার, উদাসী। আলস্যে সময় কাটায় গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, অনাবিল তৃপ্তিতে হাত ঘষে পরণের মেষের চামড়ার নরম লোমে। নির্নিমেষ চেয়ে থাকে ঐ মেষগুলোর দিকে। চঞ্চলা হরিণীর শিং জড়িয়ে গিয়েছে লতার জালে। দূরে শিকারীর উল্লাস, হরিণীর চোখে বেদনা বিধুরতার ঢল।

নেত্রীর অবস্থাও বুঝি বা তাই। স্থান বদলের কথা বললেই চোখে আগুন জ্বলে। কেমন যেন বদলে যাচ্ছে দিনে দিনে; স্বজাতির সঙ্গ ছেড়ে মেষপালের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এভাবে ত বন্যজীবন চলে না। তাদের বেঁচে থাকার তাগিদে চলতে হবে এখান হতে ওখানে; কখন আত্মরক্ষার কারণে, কখনও বা শিকারের সন্ধানে। এতদিনের অভ্যাস মাংসলোলুপতা ছেড়ে নিছক সব্‌জী আর কতদিন ভাল লাগে। তার উপর এই বসে থাকা প্রায় চুপচাপ একেবারে অসহনীয়।

শেষ পর্যন্ত সম্মতি মিলল। শিকারে যেতে পারে যার খুশী; নেত্রী নিজে যাবে না। দলে সাড়া জাগল, উল্লাসের দামামা বাজল। গুটি তিনেক উঠতি বয়সী মেয়ে আর মেষপাল নিয়ে নেত্রী সেখানেই রয়ে গেল। 'অবলা' শব্দটির জন্ম তখনও হয়নি; সুতরাং এদের দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

জীবনযাপনের এক নতুন দিগন্তের সন্ধানে যেন নেত্রী মেতে উঠল। মেষগুলিই হল তার ধ্যানজ্ঞান অবলম্বন। পাথরের অস্ত্র আছে সব সময় হাতের নাগালে; কিন্তু ব্যবহার শুধু নিজের ও ওদের আত্মরক্ষার কারণে। সে জানে না, বোঝে না তার মনের প্রতিক্রিয়া। তবে একটা কিছু ঘটছে; সে বদলে যাচ্ছে, যেন অপ্রতিহত কোন শক্তি তাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে নতুনভাবে গড়ছে এমন ধরণের ভাসাভাসা বোধ জাগছে। কথায় বলে ঠেলায় পড়লে বাঘে ধান খায়। বোধের জাগরণই তার জীবনের ঠেলা। হাতের কাছে

শিকার এসে গেলে ঝলসানো মাংসর পুরোণ স্বাদ ফিরে পায়, নয়ত মেষগুলোর মতই ঘাসপাতা খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

কালের চাকা ঘোরে। যে তৃণভূমিতে ঐ মেষপাল ধরা পড়েছিল তা একদিন ধূসর ভূমির রূপ নিল, বর্ষায় জলার জল সেখানে উথ্‌লে উঠে স্থানটায় সবুজ রং-এর গালিচা বিছিয়ে দিল। বটতলায়, যেখানে ঐ তৃণবীজ নিয়ে এসে ওরা চিবিয়েছে ছিটিয়েছে, দেখল সেখানেও মাটির বুক চিরে ছোট ছোট সবুজ চারার আবির্ভাব। বোধ জাগল, তবে কি এই ঘোর বর্ষণ উদ্ভিজ্জগতকে প্রাণকে সজীব করে রেখেছে? নিজেদেরও পিপাসায় জল না পেলে বেঁচে থাকা দায় হয়। তবে কি জলই জীবন? কিন্তু জলপান করে ত কই তারা চারজনে ভূমির মত নতুন সৃজন করতে পারছে না।

যা ছিল না, এমন একটা কি যেন ধীরে ধীরে তাকে পশু হতে স্বতন্ত্র করে দিচ্ছে; স্বজাতি হতে ভিন্নতর হয়ে পড়ছে। সঙ্গিনীদের বলতে বোঝাতে চায়, ওরা কিছু বোঝে না।

বর্ষার শেষে সেই অদ্ভুত বাঁকানো শিংওয়ালা স্ত্রী মেষটির বাচ্চা হল। তাই দেখে হঠাৎ নেত্রী অস্বাভাবিক কিছু পাওয়ার আনন্দে চীৎকার করে উঠল। ছুটে এসে বাকিরা তাকে ঘিরে ধরল। সে বুঝিয়ে দিল হত্যারচেয়ে এ কত সহজ। পোষ মানাও, হিংস্র পশু হতে রক্ষা করো; এরা বছর বছর সংখ্যায় বাড়বে, ঘরে বসেই মাংস জুটবে, নতুন খাদ্য ওদের দুধ।

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বাঁচার তাগিদে আর আত্মরক্ষার কারণে বুদ্ধির প্রয়োগ কমবেশী সকল জীবজন্তুই করে। এগুলো ছাড়াও বন্য জন্তু এমনিভাবে ধরে রাখতে পারলে পাওনা আরও বাড়বে। মানবজীবনে পশুপালন প্রবৃত্তির সেই প্রথম বিকাশ।

বর্ষণের দুর্বিসহ দিনগুলো কেটে যেতে আকাশের সঙ্গে বসুমতীর রংও বদলে যায়। সবুজ গালিচা আর নাই, কেঁপে ফুলে বাতাসে দুলছে গেরুয়াধারী হয়ে মাথায় বীজের জটা নিয়ে। বটতলার

চারাগুলো নাই, সেগুলো একটু বড় হতেই মেষগুলো খেয়ে ফেলেছে। থাকলে হয়ত ঐ রকম ঝুঁটি বাঁধত মাথার উপরে।

যারা শিকারে গিয়েছিল তারা আর ফিরল না। দিনের হিসাব কেউ জানে না। মেষপাল বেশ বড়সড় হয়েছে, ইতিমধ্যে গুটি কয়েক বধ করে নিজেরা খেয়েছে। চামড়াগুলো ছাড়িয়ে রেখেছে। নিজের মত তিনটি মেয়েকেও মেষের চামড়া পরিয়েছে, ওরা এখন যৌবনে ভরপুর। নেত্রীর বিস্ময় জাগে ওরা ত যথেষ্ট জলপান করে, কোন হিংস্র আক্রমণে রক্তপাত ঘটে নির্জিব হয়নি বা মরেনি, ওরা তারই সমান সমান হয়েছে, দল থাকলে এতদিনে নেত্রীত্বের লড়াই শুরু হয়ে যেত; কিন্তু এত সত্বেও চারজনের কেউই ত স্ত্রী মেষগুলির মত প্রাণের সৃষ্টি করতে পারছে না। অজানা দেহজ্বালায় নিজেরা নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি কামড়াকামড়ি করেছে হিংসায় নয়, কি যে প্রবৃত্তি উৎকট হয়ে ওঠে তখন। তারপর অবসন্নতা আসে; কিন্তু প্রাণের সৃষ্টি হয় না। তখনই খেয়াল হল বটতলায় বীজ ছড়িয়েছিল তাই প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল। বীজ চাই প্রাণকে আহ্বান করতে; আপনা হতে হয় না। মেষপালে স্ত্রীপুরুষে মিলিত হচ্ছে কিছুকাল কাটছে, তারপরই বাচ্চার আবির্ভাব। এক হতে বহু।

নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে নিত্য নতুন উপলব্ধি। এখন মেয়ে তিনটেও নেত্রীর ভাবধারাকে অনুসরণ করতে শিখেছে। ব্যতিক্রমের ধারার আবির্ভাব ঘটেছে এদের মধ্যে। আদিম বন্য মানুষের মধ্যে ভিন্নতর জীবনযাত্রা।

এমন সময় অঘটন। হঠাৎ দূরে উৎকট চীৎকারে ওরা সচকিত হয়ে উঠল; মেষপালেও অস্থিরতা, ছুটোছুটি করে সংঘবদ্ধ হয়ে আর্তনাদ। তাদের সমবেত আর্তনাদ হয়ত উৎকট চীৎকারকে আরও কাছে টেনে আনল। গাছের ডালে বসে ওরা মানুষগুলোকে দেখতে পেল। কয়েকটা পাথরের টুকরো মেষপালের উপর পড়তেই

নেত্রীর হাতের কুঠারটা ধরাশায়ী করল ঐদলের প্রথম সামনে এগিয়ে আসা মানুষটাকে। বাকি তিনটি মেয়েও একই পথ ধরল। তারপর অস্ত্র হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুখ সমরে। এদের দেখে বিশেষতঃ কোমরে জড়ানো মেষচর্ম, ওদলের মানুষগুলো থমকে গেল। উর্ধাঙ্গ তাদের মত, অথচ নিম্নাঙ্গ আবরিত। অজানা ভয় পেয়ে পালাতে লাগল; মেয়ে চারটে চীৎকার করে নিজেদের স্বাভাবিক ইংগিতে আশ্বস্ত করে সন্ধি করল। ছিল চার জন, হয়ে গেল চার-গুণ। মৃতরা পড়ে রইল দূরে। অন্যদিকে মৃত আহত মেষগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে লতার বাঁধনে ঝুলিয়ে দিল গাছের ডালে; আগুন জ্বালল নীচে। আগন্তুক দলের মেয়েদের কোমরে জড়িয়ে দিল মেষচর্ম। ভাবের আদান প্রদান ঘটল। নেত্রী তার এতদিনের উপলব্ধি বুঝিয়ে দিল নবাগতদের আগুনের বেড়াজালের মধ্যে বসে ঝলসানো মাংস খেতে খেতে। রাতের আকাশে অগণিত তারার জৌলুস ম্লান করে ছায়াপথের প্রবাহ। সেইকালে তখন আমাদের হিসাবমত বসন্ত ঋতু। নেত্রী তার তিন সঙ্গী নিয়ে ওদের চোখে বনদেবী হয়ে উঠল। একদা বহু প্রজন্ম আগের ভেসে আসা শ্বেতা উদ্‌বিড়ালী কৃষ্ণবর্ণ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অপ্সরা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসেছিল, তেমনি এই প্রজন্মে এই নেত্রী সেই মানবযূথের কাছে মেষযাগের সূত্রে রাতভোর অবাধ মিলনে হুল্লোড়ে বনদেবীর ধ্যানকে প্রাণবন্ত করে তুলল।

ওরা চারজন ছিল: এখন সকলে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নব্য জীবনধারা মেনে নিয়ে নেত্রীকে রাখল উর্ধাসনে। তার ইচ্ছা সকলের ইচ্ছা, তার উপলব্ধি সকলের উপলব্ধি। শক্তি বৃদ্ধি ঘটায় ওরা বড় জন্তুদেরও ধরে এনে পোষ মানালো। সংখ্যা বাড়ায় রক্ষার দায়িত্ব বাড়ে, পশুচারণ ক্ষেত্রের পরিধি বাড়াতে হয় ওরা ছোটছোট গাছগাছালি ঝোপঝাড় উপড়ে বীজ ছড়িয়ে দিল।

সময়ের চক্রে আবার রাতের আকাশে ছায়াপথের উদয় হয়।

চার কন্যার কোলে ওঠে চার সন্তান। বন্ধ্যা স্তনের বৃন্ত উপ্‌চে ঝরে পড়ে পিযুষধারা, যার স্বাদ ইতিমধ্যে পেয়েছে তারা পালিত ছাগ মেষ গো মহিষের স্তন হতে।

কালের আবর্তে একদিন এরাও হারিয়ে গেল। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভিতর দিয়ে তাদের সেই উপলব্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। তাই পরবর্তী এক প্রজন্মে দেখা গেল শিকার হয়ে গেল গৌণ, মুখ্য জীবিকা পশুপালন ও কৃষিকাজ। হাজার হাজার নানা ধরণের পশুকে বশ মানিয়ে এক একটি মানবগোষ্ঠী বনের গভীরতা হতে বেরিয়ে পড়ে নদী-সেবিত এলাকাকে আশ্রয় করল, যেখানে পশুচারণ ভূমি আছে, পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া যায়, সহজেই মাটির বুকে ফসল ফলানো যায়। নারীর মত পুরুষরাও নিজেদের আবৃত করতে শুরু করল। পশুচর্মের অনটন ঘটলে গাছের পাতা ত্বক উভয়ে ব্যবহার করত। একদিন যা ছিল হঠাৎ অনুভূতির ভিতর দিয়ে অঙ্গে তুলে মজা পাওয়া, তাই পরিশেষে অভ্যাস ও রীতিতে দাঁড়িয়ে গেল। জন্ম নিল লজ্জা নামক জ্ঞানের।

সৃষ্টির সেই কোন্ উষালগ্নে পরমপিতা ও আদ্যাশক্তি কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে প্রথম একত্রে জ্ঞানলাভের রসাস্বাদন করেছিলেন তারই ফল স্বরূপ সৃষ্টিরক্ষার সহজাত নিয়মের উন্মেষ। বহু বহুকালের ঘষামজায় পরিস্থিতির তাগিদে প্রাণীজগতে আদিম মানবমানবীর ক্ষেত্রে মন নামক শক্তির আবির্ভাব ঘটল। অননুভূতপূর্ব অনেক অনুভূতি ও উপলব্ধি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে তাকে অন্য প্রাণী হতে স্বতন্ত্র করে তুলল। নিছক প্রকৃতির দানের উপর নির্ভরশীল না থেকে বা প্রকৃতিকে সহজ নিয়মে মেনে না চলে সে প্রয়োজনের তাগিদে বেঁচে থাকার উপায় পদ্ধতি আয়ত্ব করতে আরম্ভ করল। এই প্রচেষ্টার দরুণ দ্রুত নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন।

হঠাৎ সেই প্রজন্মের নেত্রীর মনে হল বীজ দান করে পুরুষ এই দানসত্রের বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। প্রাণী মাত্রই এক পদ্ধতি।

একজন দাতা, অন্যজন গ্রহীতা। পরবর্তীকালে গ্রহীতা উৎপাদন করে। তাদের মত ভূমি ফসল দান করে বীজ ছড়ালে এ যেন নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। বীজদান ও বীজগ্রহণের প্রক্রিয়া ঠিকমত না হলে হবে কেন? ভূমিকে যে বিকশিত করে দূর আকাশের সূর্য, বনের ওপার হতে নয়ত বড় পাহাড়ের ওধার হতে অথবা সমুদ্রের অতল হতে আত্মপ্রকাশ করে আলোয় উদ্ভাসিত করে দিগ-দিগন্ত, সেই নিশ্চয়ই দাতা। কিন্তু তাকে ত ধরাছোঁয়া যায় না, ভূমি ত অনড়। তাদের মত নয়। তবু কর্ষণ না করলে যথাযথ ধারণ কিভাবে করবে।

এই ভাবনার ভিত্তিতে তারা ফাঁপা বাঁশের ফোঁকড়ে সুঁচালো পাথরের টুকরো আটকে নিজের দেহ দিয়ে ঠেলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনড় ভূমির গর্ভদেশ উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হল। অনেকটা নিজেদের প্রাণসৃষ্টির আদবকায়দার অনুকরণ। এবার ফসল হল দ্বিগুণ। উৎসাহ বেড়ে গেল। সাড়া জাগল ধরিত্রীকে কর্ষণ করতে পারলে ফল হবে ভাল।

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। পালিত পশুর বাঁট টেনে দুধের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু সে ত সরাসরি গ্রহণ, আহরণ করতে হবে। গাছের বড় বড় পাতার খুপরি করার উপায় জানা হযে গেল, আরও পরে এলো বাঁশের চোং। পশুপালন সূত্রে নারী দোহন করে সেই হেতু তার আরেক পরিচয় হল দুহিতা।

ভূমির আরও গভীরে বীজ স্থাপন করতে হবে। বড় পাথরের চাঁই ঘষে ঘষে খননযন্ত্র উদ্ভাবিত হল; চেহারায় কল্পনা করা যায় হিন্দুশাস্ত্রের শিবলিঙ্গের প্রাথমিক রূপাকৃতি। গৌরীপট্টর বর্ধিত অংশ ছিল সুচাঁলো, সেটা চেপে ধরা হত ভূমিতে, অপর অংশের নিজস্ব ওজন ছাড়াও ওটার উপর চাপ রাখা হত। লতা দিয়ে শক্ত-ভাবে বাঁধা সেটিকে লতার অপর প্রান্ত ধরে টানত নারীরা। এই ছিল লাঙ্গলের প্রথম রূপ। লিঙ্গ শব্দ হতে লাঙ্গল; অতএব

লিঙ্গর প্রতীক এবং তা অবশ্যই পুরুষের। তখনও পালিত পশুকে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়নি। অতএব সব দায় নারীর। ধীরে ধীরে জীবনযাত্রা বদলের তালে তালে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ভাগ হতে শুরু করে। পুরুষরা খননযন্ত্র তৈরী করে দেয়, হিংস্র পশু বা অন্য দলের মানবের আক্রমণ হতে গোষ্ঠীকে রক্ষা করে, শিকারে যায়, ধরে আনে বশ মানানোর জন্য নিত্য নতুন জন্তু। নারী পশু পালন করে, ভূমি কর্ষণ করে বীজ বোনে, ফসল তোলে, আহারের যোগান দেয়, সন্তানধারণ করে। কৃষি নির্ভর হওয়ায় বিচরণের তাগিদ কমে যায়, বসবাস শুরু হয় চাষ ও বিচরণক্ষেত্র কেন্দ্র করে। বাড়তি ফসল ফলে নতুন উপায়ে। এখন আর দিন আনি দিন খাই নয়। অতএব ঘর বাঁধার তাগিদ। বট অশ্বথের জঠরে শস্য রাখা যায় কত, কতজনের স্থান দেওয়া যায় সেখানে। আর সর্বত্রই ত এমন আশ্রয়দাতা জোটে না যদিও চাষ ও বিচরণ ক্ষেত্র পর্যাপ্ত। মানুষ লতাপাতা দিয়ে ঝুপড়ি বানাতে শিখল। নারী তখনও পুরুষের সমান তালে, গোষ্ঠীর নেত্রীত্বে; তবু সে নিজেকে বেশী করে কৃষি ও পশুপালনে জড়িয়ে ফেলল।

চাষে নেশা ধরায়। রাতের আকাশের তারা দেখার মত; মাসে মাসে কেমন পট বদলায়। ভূমিও তাই। প্রচণ্ড দাবদাহে ভূমির রং ধূসর, বৃষ্টি নামলে সবুজের সজীবতা, ফুল ফোটে ফল ধরে শরৎ হেমন্তে সোনালী ঝিকিমিকি, শীতে নিদারুণ কৃশতা, বসন্তে উচ্ছ্বাস উদ্বেলতার রাঙ্গা রূপ।

ওরা রাতের আকাশের চিত্র চিনে ফেলেছে, ঋতুর রং বদল ধরতে পারছে। তাই কর্ষণের সময় এলে নারী মাতোয়ারা। ভূমিকে ঋতুমতী করতে নিজেই ভূমির প্রতীক হয়ে চাষের শুরুতে চাষজমিতে পুরুষকে জানায় আহ্বান। দিনরাত চলে উদ্দাম মাত্রাহীন মিলন। আপনা হতে কণ্ঠে সুর বেজে ওঠে,—কর্ষণ করো; আরও, আরও বীজ দান করো; আমার বন্ধ্যাত্ব দূর করে আমাকে উর্বরা করো,

উৎপাদন করতে দাও। আমি যেন তোমার কাছে এতটুকু পেয়ে অনেক দিতে পারি।

নারী নিজেকে তখন ভূমি কল্পনা করে; ভাবে, নিজে যথাযথ কর্ষিত হলে সেও ঠিক ঠিক ভূ-কর্ষণ করতে পারবে; তাহলে প্রচুর ফসল জন্মাবে। তার দেহের ঘামে ভূমি ভিজবে, দেহ সঞ্চালনে হাতপায়ের প্রক্ষেপণে ভূমি জেগে উঠবে যৌবন শিহরণে। তখন ভূমি আর নারী একাত্মা হয়ে যায়। তাই ত পরবর্তীকালের ঋষি নারীকে 'ক্ষেত্র' বলে সম্বোধন করেছেন।

হায় নারী! আজ তুমি জানিলে না ভবিষ্যৎ প্রজন্মে কি হারাইলে। সৃষ্টির আনন্দে বিমূঢ় হইয়া সেচ্ছায় শীর্ষাসন ত্যাগ করিয়া ভূ শয্যা গ্রহণ করিলে। সমতালে পদক্ষেপণ বিস্মৃত হইয়া পুরুষের পশ্চাদনুসারিণী হইলে। পশুপালন ও কৃষিকর্মের সূত্রে তুমি সমকক্ষতা ত্যাগ করিয়া পুরুষকে রক্ষাকর্ত্তার আসনে বসাইলে, জানিলে না রক্ষক একদিন ভক্ষক হইবে। অস্ত্র হিংসা শুধু হননে ও আত্মরক্ষায়। জানিলে না ভবিষ্যতে ভূমি গ্রাসের লালসায় গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব যখন শুরু হইবে তখন তুমিও ভূমির অংশজাতা হিসাবে গণ্য হইবে। আজিকার এই ভূপতন কালক্রমে তোমার সকল পতনের কারণ হইল। ক্ষেত্রকে উর্বরা করার বাসনায় পুরুষকে প্রাধান্য দিয়া প্রকারান্তরে আপনাকে দাসীত্বে পরিণত করিলে। পুনরায় বলিতেছি তুমি সেচ্ছায় সমকক্ষতা পরিহার পূর্বক ভূমিতলগতা হইয়া পুরুষকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বন্ধনকে মানিয়া লইলে। ভূমির মত তুমিও বাহুবলের অধীনা হইলে। নারী! একদা বসুন্ধরা বীরভোগ্যা হইবে। তখন তুমিও ভোগ্যা পণ্যা মাত্র হইবে।

ভোগ্যা! পণ্যা!

সমাজ নামক বন্ধনটি যখন সভ্যতা অভিধেয় চিন্তাধারার টানে

ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে মানুষের মনে চেপে বসল, কৃষিকে অবলম্বন করে নগরের বিকাশ ঘটল সেই স্মরণাতীত কাল।

নেতৃত্ব পুরুষের হাতে উঠে আসায় নারী হারালো স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র, স্বাধীন বিচরণের অধিকার। গৃহপালিত পশুর মত ধীরে ধীরে কালে কালে গার্হস্থ জীবনের স্বাদ নারীকে অহিফেনের নেশায় মগ্নতায় পুরুষের সহচরী হতে প্রজা প্রজননের কারণে জায়াতে রূপান্তরিত করল। অতএব মনু উবাচ—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।

এই মনুর সময়কালে পৌঁছুতে প্রথম অগ্নি জ্বালানো শেখা বন্যমানুষকে কয়েক হাজার প্রজন্ম পেরিয়ে আসতে হয়েছিল; প্রাগৈতিহাসিক যুথবদ্ধ মানব বৈদিক-পৌরাণিক যুগকে পিছনে ফেলে পরিশেষে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সীমানায় ধরা দিয়েছে। যে পৃথিবী ছিল একদা মানবগোষ্ঠীর সার্বজনীন বিচরণ ক্ষেত্র, তাই তখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে অধিকারের এক্তিয়ারে পরিণত হল; দৈহিকশক্তি আর জনবলের সহায়তায় সাম্রাজ্য নামক নিজ নিজ এলাকা। একের সঙ্গে অপরের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতরা নিজ নিজ ধ্যানজ্ঞান দিয়ে মানবগোষ্ঠীর এই বিবর্তনের নানা মতবাদ তুলে ধরেছেন। তা নিয়ে এখনও চলছে লড়ালড়ি, স্থির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি, হয়ত যাবেও না আর। যেমনটি হয়েছে উর্বশীর ক্ষেত্রে।

ভাবতে হয় সমাজ আর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ক্ষুধা নিরসনের নিমিত্ত পশুপালন আর কৃষিকাজের ভিত্তিতে গ্রাম, জনপদ, নগরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বল্কল ছেড়ে কাপাস বস্ত্রে লজ্জা ঢেকে নারী নিঃশব্দে নেতৃত্ব ত্যাগ করে নিরীহ মেষশাবকের মত পুরুষের তৈরী অন্তঃপুরে বন্দীজীবন মেনে নিয়েছিল কিনা। এখানে তথ্য নির্বাক, সূচীভেদ্য অন্ধকার। কল্পনা একমাত্র বল্গাহীন। এই কল্পনানেত্রে অবলোকন করে বলা যায় একদা নারীতে নারীতে নেতৃত্বের যে লড়াই ছিল, তেমনি লড়াই পুরুষে নারীতেও নিশ্চয় ঘটেছে। আকস্মিক

কোন ঘটনা অবশ্যই নারীকে অন্তঃপুরবাসিনী করে তোলেনি। পুরুষ ছিল আজ্ঞাবহ; নারী সাম্রাজ্ঞী। জ্ঞানফলের রসাস্বাদনের পর হতেই পুরুষ নারীর যৌবনের আকর্ষণে কানামাছি। জীবনযাত্রা যখন বদলে গেল; গোলাম হল নবাব আর সাম্রাজ্ঞী বাঁদী। তবু পুরাণ আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই বাঁদীর রূপ-বহ্নিশিখার দহনে পুরুষ চিরন্তন জ্বলছে; পুড়ছে সেই আগুনে, লালসার জ্বালায় যুদ্ধযাত্রা করছে, ভরিয়ে তুলছে আপন অন্তঃপুর, গড়ছে হারেম। ধর্মের প্রলেপনে দেবদাসী, বহুর তৃপ্তির কারণে সুন্দরীশ্রেষ্ঠার জনপদশোভিনী স্বরূপ, সর্বজনভোগের কারণে বারাঙ্গণার আত্ম-প্রকাশ, পরিশোধিত বোধের সূত্রে ইন্দ্রসভার অনুকরণে কঞ্চুকী নটী সম্প্রদায়ের সৃজন। নারী হল শুধু সামর্থর: সে দৈহিক হোক বা অর্থকৌলীন্যেই হোক; ক্রীতদাসী, ভোগ্যা, পণ্যা।

আদিম মানবের জীবনকালে জল হতে উঠে আসা সাদা বা কালো গায়ের রং যৌবন-পুষ্টা রূপশ্রী অপ্সরার চিন্তা, নক্ষত্রখচিত আকাশের শুভ্রবসনা ছায়াপথকে স্থিরনেত্রে অবলোকন করে ঋষির উর্বশী ধ্যান হারিয়ে গেল; পরমপিতার আশীর্বচন মাত্র মূর্ত হয়ে উঠল জীবজগতের আদিম রিপুর তাড়নায় দেহবাসনার ঝাঁঝালো উন্মত্ত দুর্বীসহতায় প্রতিমায়িত একটি সত্তা।

এ কারণেই হয়ত একদা গার্হস্থের জালে ধরা না দিয়ে স্বাধীন-চেতা অনেক নারী হারিয়ে গিয়েছিল গহনবনে। তখনও নারী পুরোপুরি ভোগ্যা পণ্যা হয়ে ওঠেনি। ফলে যে ছিল একদিন অপ্সরা উর্বশী, সেই নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল জ্ঞানীগুণীর দৃষ্টিতে—বনদেবী। বৃক্ষদেবী। যক্ষিণী।

তখনও পরিপূর্ণ বন্দীত্ব নারীকে গ্রাস করেনি। বিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়েও যেমন দেখা যায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গভীর বনে মানুষের অস্তিত্ব, যারা আজকের চোখে বন্য অসভ্য; তেমনি পুরাণ মহাকাব্যর যুগেও যখন ধরিত্রীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ক্ষমতার অদৃশ্য

সীমারেখা টেনে রাজা মহারাজা রাজচক্রবর্তীর আবির্ভাবে মানুষ সভ্য হয়ে উঠেছে বলে দাবী করেছিল তখনও কিন্তু বনবাসীর অস্তিত্ব ছিল। বরং তুলনায় তারাই ছিল অনেক বেশী ; যাদের পরবর্তীকালে সম্পদবৃদ্ধির তাগিদে ধরে এনে ক্ষেতের কাজে, ইমারত নির্মানের প্রয়োজনে, যুদ্ধযাত্রায় সেনা হিসাবে নিযুক্ত করা হত। এই মানসিকতা পরিশেষে কৃতদাস প্রথার জন্ম দিল।

সভ্য যারা, যে সমাজের পুরুষ নারীকে তার বৈভবের উপকরণ হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল, অবদমিত করছিল তাদের নির্মম ভাবে ; সেই সভ্যতার নিষ্পেষণকে যারা সহজে মেনে নিতে পারেনি তারাই এক সময় হারিয়ে গিয়েছিল বনজঙ্গলে। তারা চমক সৃষ্টি করেছে বনবাসীদের মনে। সেই কোন্ এক যুগে ভেসে আসা উদ্‌ভিড়ালী, পরে মেষপালের মোহে লজ্জার উদ্‌ভাবনকারিনী যে স্বপ্নের রূপ দিয়েছিল ; সেই ধ্যান বিকাশিত হল নতুন ভাবে।

খুবই স্বাভাবিক। সর্বস্ব খুইয়ে নিষাদরাজ নল পত্নী দময়ন্তীকে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরছে বনে বনে। উপায় নেই। ভাই পুস্কর ঘোষণা করেছিলেন কেউ এদের কোন সাহায্য করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ক্ষুধার্ত নল একদিন নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা কতগুলি সোনারঙ পাখী ধরতে গেলে সেই পাখীগুলো ঐ বস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গেল। বেচারা স্ত্রীর পরিধেয়ের অর্ধেক দিয়ে লজ্জা নিবারণ করল। একদিন রাত্রে দময়ন্তী ঘুমিয়ে পড়লে কি মতিভ্রম ঘটল, নল সেই কাপড়ের বাঁধন ছিঁড়ে স্ত্রীকে ফেলে নিরুদেশ যাত্রা করে। অর্ধাংশ শাড়ীতে নিজেকে আবৃত রেখে পরিস্থিতি বুঝে দময়ন্তী দিশেহারা হয়ে নলকে খুঁজতে গিয়ে এক অজগরের মুখে পড়ল। তার আর্তনাদে একব্যাধ অজগরকে হত্যা করে নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে দময়ন্তীকে গ্রহণ করতে চাইলে সতীর অভিশাপে ব্যাধ দেহত্যাগ করল। এর পর নলের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এক বণিকদলের সঙ্গ পেল। পথে হাতীর আক্রমণে বহু বণিকের মৃত্যু হলে দময়ন্তীকে

অপয়া-জ্ঞানে হত্যা করবে ঠিক করল। দময়ন্তী বুঝতে পেরে বনের মধ্যে লুকিয়ে বাঁচল। পরে বণিকদলের কয়েকজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে চেদিরাজ সুবাহুর রাজধানীতে এলে তার রূপে মোহিত হয়ে রাজমাতা তাকে সৈরিন্ধ্রী হিসাবে আশ্রয় দিলেন।

এর পর আরও অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে গল্পকার নল দময়ন্তীর মিলন ঘটিয়েছেন।

গল্পকথা থাক। সে ত এগিয়ে আসা যুগের মানুষের যখন জ্ঞান পরিপূর্ণতা না পেলেও পরিপক্ক। অতএব তৎকালীন চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে অতীতের কোন ঘটনা হয়ত রূপ নিয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীতেই বিগত কালের হারিয়ে যাওয়া নারীদের স্মৃতি বীজাকারে বিরাজমান।

দময়ন্তী রাজকন্যা, রাজবধূ; তাই তাকে নিয়ে গল্প, অনেক পিছনে ফেলে আসা প্রজন্মের মূল ঘটনার ঘষামাজা জেল্লা দেওয়া কাহিনী। একদা এমন কত দময়ন্তী জনপদসভ্যতা হতে বিচ্যুত হয়ে নানা কারণে বনান্তরালে বিলীন হয়ে গিয়েছে, যারা রূপকথার নায়িকা হতে পারেনি, কিন্তু তাদের জীবন-পরিণামের ছাপ চিরকালের মত মানুষের চিন্তায় রেখে গিয়েছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, অসাধ্যকে সাধন করতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ অঘটনঘটনপটিয়সী, তাঁকেও ভৃগুপদচিহ্ন বহন করতে হয়েছে; মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। অনেক চিহ্ন স্থায়ী হয়ে যায়।

এই নিঃসঙ্গ বনবিহারিনী, যাদের অনেকেই পরাধীনতার সাতনরীহার গলায় তোলেনি, তারা ক্ষুৎপিপাসায় হয়ত ঝরণা বা নদীকূলে বসে থেকেছে, বিহ্বলচিত্তে বৃক্ষতল আশ্রয় করেছে। আর তখনই; বনে যাদের বাস, পশুচর্ম বল্কল বা পাখীর পালকে লজ্জা ঢেকে বেঁচে আছে প্রকৃতির দানে; ওরা সেই কন্যাকে দূর হতে দেখল। বৈষম্য বৈচিত্র্য সর্বকালে প্রাণীজগতের সকল জীবকে হয় ভয় দেখায় নয়ত কাছে টানে, তা সে শব্দ গন্ধ স্পর্শ দর্শন যাই হোক

না কেন। পাতা পড়ার শব্দে হরিণ ছুটে পালায়, বীণাবাদনে বিপদ ভুলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে শিকারীর হাতে ধরা দেয়। সঙ্গহীনা দময়ন্তীর পরিধানে শাড়ীর অর্ধাংশ ছাড়া আর কিছু ছিল কিনা গল্পকার বলেন নি। না বলুন, কিন্তু সেকালের নারীর বসন তালিকায় সায়া ব্লাউজ ব্রা প্যান্টির বোঝা নিশ্চয়ই থাকত না। অতএব শাড়ীর অর্ধাংশে দময়ন্তীর আব্রু ঢাকার ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট। রাজবধুর এই হাল হলে অন্য দময়ন্তীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কেউ সালঙ্করা মহার্ঘ ভূষণে রূপসী, কেউ বা পাকেচক্রে সর্বহারা স্বল্পবাসা। ওদের প্রথম দর্শনে হয় পলায়ণ অলক্ষ্মীজ্ঞানে, অথবা সাদরে বরণ দিনটা যদি ভাল যায়। জল হতে উঠে আসা অপ্সরা আর গভীর বনে সাক্ষাৎ পাওয়া বনদেবীর ধ্যানটা একই; ঘটনা ও পরিবেশে যা তফাৎ।

বসুদেব-বৈষ্ণবীয়, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈনবাদীদের প্রথম আবির্ভাবের কাল পর্যন্তও নানা ব্যক্তিত্ব, কাহিনী ইত্যাদির মধ্যে নারীর স্বকীয়তা ও স্বাধীন সত্তার ক্ষীয়মান অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়; যদিও গৃহকোণের সুখসাচ্ছন্দ আর ধর্মীয় আবরণে দেবভক্তির উগ্র আরকে নারীকুলের গরিষ্ঠতম অংশ ষোড়শকলায় নিপুণা হওয়ার চেষ্টায় মগ্না। লঘিষ্ঠতমারা ওদের চোখেই হয়ে গেল বিদ্রোহীনি। সুযোগ বুঝে পণ্ডিতগণ দুটি শব্দর উদ্ভাবণ করলেন এদের জন্য—স্বেচ্ছাচারিনী, কামচারিনী।

মূলতঃ দুটি শব্দই স্বাধীন মনোভাবাপন্নার দ্যোতক। কিন্তু নারীর পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা যত প্রকট হয়ে উঠল এবং অন্যদিকে পরাধীনতাকেই তার স্বাভাবিক জীবন বলে মেনে নিল; তখন ওদের ভোগ্যা বা পণ্যা হওয়ার শেষ বাধাটুকুও ঘুচে গেল। রাজ্য রক্ষার কারণে অশ্বশালা, হস্তীশালার ভরণপোষণ যেমন প্রয়োজন ছিল পুরুষের বীর্যবত্তা প্রকাশের জন্য, তেমনি ভোগবিলাস উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে অন্তপুরে দেশদেশান্তরের শত শত নারীর সমাবেশ। পশু-

যূথে আহারের ভাগাভাগি নিয়ে রেশারেশি, অন্তঃপুরে ভর্তার অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় পরস্পরের প্রতিযোগিতা। এখানে মূলধন শুধু নিজ দেহসৌষ্ঠব, হাস্য, লাস্য, নির্লজ্জতা, কুটিলতা। নারী নিজেই যখন দেহসর্বস্ব হয়ে উঠল, তখন সেচ্ছাচারিনী বা কামচারিনী শব্দদুটিও দেহভিত্তিক হয়ে দেহোপজীবিনী অর্থে দাঁড়িয়ে গেল। অপরদিকে অপ্সরার পাশাপাশি বনদেবীর প্রতিষ্ঠা। প্রাণ হতে প্রাণের যেমন আবির্ভাব, তেমনি আদিমতম মানবের সহসা উদ্ভূত এক ধ্যানের জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে মৃত্যুহীন সঞ্চরণ।

কিন্তু তারপর?

যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি ডাক দিল। গৃহকোণে গৃহিনী গোপিনীদের মন উতলা। ঘর ছেড়ে সহস্র গোপিনী সুরের ছন্দে দুলছে, ঘুরছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, যুগ বদলের ইংগিত। বিশ্বজননীর কামনা; সেই যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—পুরুষ; পুরুষ ত একজনই।

এই শ্রীকৃষ্ণ; জরাসন্ধের ভয়ে যাদবকুলকে নিয়ে দ্বারকায় নতুন বসতি করলেন। তিনি হলেন কৃষ্ণরাজা, পশ্চিমসমুদ্র হতে পূর্বসমুদ্র ওদিক উত্তরে হিমালয় এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে রাজচক্রবর্তী। রাজা হলেই রাণী থাকবে, একে হয় না একাধিক। আর রাণী থাকলেই অন্তঃপুর। আগে ছিল সহস্রগোপিনী সহ রাসলীলা, পরে দ্বারকার রাজপ্রাসাদে ষোড়শসহস্র নারীর অন্তঃপুর। একদা জরা আক্রমণ করল। কৃষ্ণরাজা ইহলীলা সংবরণ করলেন। অর্জুন সেই বিরাট নারীবাহিনীকে হস্তিনাপুর নিয়ে আসছিল; পথে লুঠেরার হামলা।´

উর্বশীর রূপান্তর এখানেই নতুনভাবে। শস্য নয়, রত্ন নয়, নিতান্তই রক্তমাংসের মানবী কয়েক সহস্র যাদব কুলনারী। আর অশ্রুতপূর্বা অদর্শনার চমক নয়, নৈসর্গিক অবলোকন নয়, বন্দিনী

বা বনদেবী নয়, নিতান্তই লালসা চরিতার্থতার আধার মাত্র। নারীর ভোগ্যা বা পণ্যা হওয়ার বাকি রইল কি।

এই শ্রীকৃষ্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজনপূজ্য। তবু কৃষ্ণবিদ্বেষীর অভাব ছিল না। তাদেরই একজন নরকাসুর, প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা। দুর্ধর্ষ অসুরের শক্তি সকলের ত্রাসের কারণ। সে শুধু নিষ্ঠুর নয়, দেশদেশান্তর হতে ষোল হাজার যুবতী কন্যাবধুকে হরণ করে, সোজা কথায় লুঠ করে এনে নিজের রাজ্যে মণিপর্বতের শিখরে এক গুহায় বন্দী করে রেখেছিল। তাদের চোখের জলই হল হয়ত নরকের কাল। সুযোগ বুঝে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে সেই ষোল হাজার রমনীকে মুক্ত করে দ্বারকায় নিয়ে এলেন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দৈবসত্বায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বিগলিত হয়ে বললেন,—সর্বদুঃখহর যশোদা-নন্দনের কি অপার করুণা। নারীর চোখের জল তাঁকে বিচলিত করেছিল।

কিন্তু রুঢ় বাস্তবদৃষ্টিতে অন্য চিত্র। ষোল হাজার রমণীর বাসোপযোগী গুহা। এদের খিদমদগারি করতে দাসদাসী পাচক পরিবেবিকা ইত্যাদি নিয়ে আরও কয়েক হাজার। অতএব এমন গুহা, আজকের দিনের প্রমাণি মাপের একটা সহর ঢুকে যাবে যে। আর কাজকর্ম নাই, হাজার ষোল রমনীকে নিছক আমোদ প্রমোদের কারণে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াপরা জোগানো। রাজার ভরনীয় রমনী, নিশ্চয়ই একমুঠো পান্তাভাত বা ছুটো ঝলসানো রুটি খেয়ে দিন কাটতো না। তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নেওয়া হল নরকাসুর প্রচুর বিত্তশালী ও খামখেয়ালী ছিল। কিন্তু যাদের দুঃখমোচন করলেন শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনমোচন করে, তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরৎ না পাঠিয়ে দ্বারকায় নিয়ে এলেন কেন। প্রাগজ্যোতিষপুর, ঐতিহাসিকগণের মতে বর্তমান আসাম কামরূপ, সেখান হতে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রান্তের সৌরাষ্ট্রর দ্বারকা—দূরত্বটা মানচিত্রে চোখ রাখলেই স্পষ্ট হয়। এতখানি পথ ষোলহাজার রমনীর শোভাযাত্রার

পুরোভাগে শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে চলেছেন। পরম করুণাময় যদি অবলা নারীর প্রতি করুণা করে যানবাহনের ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে ত এলাহি ব্যাপার। কল্পনা করতেও দেহে সুড়সুড়ি লাগে। একটা জনপদ অতিক্রম করতে পৃথিবীকে বারকয়েক সূর্যকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আর কৌতূহলী জনপদবাসীরা নিশ্চয়ই সেই কয়দিন কাজকর্ম ফেলে চিড়েমুড় বেঁধে পথের দুধারে ভীড় করেছিল। তা করুক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও ত নরকাসুরের মতই আচরণ করলেন। অভাগিনীদের শুধু পূর্ব হতে পশ্চিমদেশে ঠাঁই বদল। তবেই প্রশ্ন ওঠে এরা কারা? ক্রীতদাসী? ভোগের সামগ্রী? ক্ষেতখামারের মজুরাণী? নানাধরনের সম্পদের মধ্যে এও এক সম্পদ - জনসম্পদ।

ইতিহাসের কালেও এই একই চিত্র দেখা যায়। সাদা চামড়ার মানুষগুলো বন্যপশুর সঙ্গে কালো মানুষও শিকার করত সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতেও। বন্দরে ঘাটে মানুষ বোঝাই জাহাজ ভিড়ত। বিকিকিনির হাট বসত দাসদাসীর। আগে ছিল খোলাখুলি, তাই এখন আড়ালে আবডালে। কয়েক দশক আগেও একটা কথা চালু ছিল—ভরার মেয়ে; যার মূল কথা দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে অথবা ফুঁসলিয়ে ঘর থেকে বের করে আনা মেয়েদের সহরে চালান দেওয়া। শোনপুরের ঐতিহাসিক মেলাতে আজও মেয়েরা বিকোয় অতি গোপনে, নানা জাতীয় ব্যবসার অন্যতম 'মেয়ে চালানি' ব্যবসা।

নারী যে পণ্যে পরিণত হয়েছে পুরাণের রসালো গল্পের আড়ালে রয়েছে তারই ইংগিত।

আর ভোগ্যা? পুরুষের দাপটে অত্যাচারে জুলুমে দেহশক্তিতে দলিত মথিত হৃতবীর্য্য হয়ে নারী বাঁচার তাগিদে নিজেকে হাস্যে লাস্যে নতুনরূপে ভোগ্যা করে তুলল। শ্রীকৃষ্ণের অথবা কার্তবীর্য্যার্জুনের সপত্নী জলকেলি তারই সাক্ষ্য দেয়। আর রাবণের অন্তঃপুর নারীর সেই স্বরূপের পরিপূর্ণ চিত্র।

অপহৃতা সীতার অন্বেষণে হনুমান ছদ্মবেশে লংকায় গিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে গভীররাতে একেবারে রাবণের শয্যাকক্ষে। আহা কি মধুর যৌবন উদ্বেলিত পরিবেশ সেখানে। বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। শুধু লক্ষণীয় নারীর রূপমাধুর্যের সঙ্গে প্রসাধন, আভরণ আর সঙ্গীতের মহামিলন। যাদবকন্যাদের মধ্যে আদিম মানবীর শৌর্যবত্তা প্রকাশ পায়নি। আর লংকার কুলনারীরা শুধু আসব-বিহ্বলা নয়: ষোড়শকলানিপুনা ইন্দ্রসভার নটী অপ্সরাদের স্বগোত্রীয়া।

তবে আর পুরাণকারের দোষ কোথায়? আদ্যিকালের উর্বশীকে টেনে হেঁচড়ে তার কালের সমাজজীবনের মানবগোষ্ঠীর মন, চিন্তাধারা, আচরণের অনুকরণে নতুন উর্বশী, স্বর্বেশ্যা নটী উর্বশীকে আমাদের কাছে উপহার দিয়েছেন।

উর্বশী-কাহিনী, বেদের গুটিকয় সূক্তের তন্বীকন্যা এভাবেই স্থুল-কায়া মহিলায় পরিণত হল। ধ্যানের উর্বশীর মৃত্যু ঘটল, মনের উর্বশীর শিখা চিরন্তন উদ্ভাসিত হয়ে রইল। নইলে জরাক্রান্ত শান্তনু দাসরাজ-কন্যা সত্যবতীর রূপে বিমোহিত হয়ে শয্যা নেয়! কারণ জেনে যুবাপুত্র দেবব্রত যার নিজেরই এমনটি হওয়ার কথা, তিনি মাতৃজ্ঞানে সত্যবতীকে পিতার হাতে তুলে দিয়ে সারাজীবন অকৃতদার হয়ে 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত হলেন। বৃদ্ধ দশরথ কি কাণ্ডটাই না করে বসল বুড়ো বয়সে। অনার্যা যুবতী কৈকয়ীর মোহজালে জড়িয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে বনবাসে পাঠালেন। প্রাণটাও গেল এই আগুন জ্বালায়। হালফিল ধর্মান্ধ প্রৌঢ় ঔরঙ্গজেব এক নজর পদ্মিনীকে দেখেই বেহাল। তাকে পাওয়ার জন্যই চিতোর ধ্বংস। পদ্মিনীর আত্মদান জহরব্রতে আর বাসনা পুরণের ব্যর্থতায় নবাবের ধর্মে আসক্তির বাড়াবাড়ি। এমন কত নজির পুরাণ ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে। এ সবই অশরীরি উর্বশীর মায়া।

আমি যখন দিবাস্বপ্নে ইতিহাস পুরাণে ডুবেছিলাম ওরা তিনজনে তখন রান্নাঘরের ব্যস্ততায়, প্রসাধনরতা, অলস মুহূর্তে শয্যাশায়িনী এমনিতর নানা পরিবেশ ও ভঙ্গীতে একালের উর্বশী অর্থাৎ পদ্মিনীকে চিত্রায়িত করে নিয়েছে।

অন্যমনস্ক ছিলাম বৈকি, তবুও চমকাইনি পিছন হতে কাঁধের উপরে দুটি নরম হাতের স্পর্শে। একটা চাপা মিষ্টি সুগন্ধ শিহরণ জাগালো। চোখের সামনে ভেসে উঠল বনের চিত্রপট, মোরগ লড়াই। একই ধরণের স্পর্শ, কিন্তু স্বাদ ভিন্নতর। বললাম,—বলুন।

পদ্মিনী সরে এলো সামনের দিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম ভদ্রতার কারণে। এত কাছে হাতের নাগালে যে পদ্মিনীর হাসি মুখে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিল। বলল,—আপনি বড্ড ঠাণ্ডা। গাল্পিকদের বুঝি এমনি হতে হয়?

আমি কিছু বলার আগেই সে আরেক ছত্র জুড়ে দিল,—অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা সে কথা বলে না। আমাদের চেয়ে তারাও অনেক ব্যাপারে কম কিছু নয়।

হাসলাম। আমি পুলকতি হই এই সান্নিধ্যে। ঝুলে থাকা হাতদুটো নিসপিস করে ওরই ভঙ্গিতে ওর কাঁধে চড়বার জন্য। সামলে নিয়ে জবাব দিলাম,—আমি ত লিখিয়ে হিসাবে তেমন কেষ্টবিষ্টু নই।

পদ্মিনীর দৃষ্টি গভীর; আমাকে মাপজোপ করছে যেন। দেহমনে অস্বস্তিবোধ জাগল, অথচ সরতে পারছিনা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে সে জবাব দিল,—ঠিক আছে। আজ হতে আমি উর্বশী। স্বর্গের উর্বশী অনেক ঋষি তপস্বীর মাথা খেয়েছে শুধু। মহৎ কিছু করেছে বলে মনে হয় না, একমাত্র স্বার্থপর দেবতাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি ছাড়া। মর্তের আমি। আমার জীবনের সর্বোত্তম স্বীকৃতির মুহূর্তে আপনি প্রথম অচেনা মুখ, যদি বলি আমার পুরুরবা। আপনাকে আমি সার্থক করে তুলব।

বলেই মাথা, ঝাঁকিয়ে গা দুলিয়ে হেসে ভেঙে পড়ল। ওরাও এতে তাল দিল। আমি বোকার মত হাসিহাসি মুখ করি। অর্জুন নয়; আমি এখন গর্দভ। তবু সপ্রতিভতা দেখানোর জন্য নাটকীয় ভাবে বললাম,—আমি ইন্দ্রত্বের তপস্যা করিনি, আপনার সাময়িক কয়েকঘণ্টার অতিথি মাত্র; কোন ইন্দ্রসভায় যাওয়ার সুযোগ নিতে চাইনি। আমার কি অপরাধ।

পদ্মিনী এমন একটা ভাব দেখাল যেন ভব্য আসরে অশ্লীল কিছু বলেছি; কণ্ঠস্বরে সেই রেশ,—অপরাধ নয়? আমি স্বর্গের নই, মর্তের। আমি আপনাকে চাইছি, আর আপনি—

কথা শেষ না করে মুখ ঘুরিয়ে পত্রকারকে আদেশ করল,—ছেপে দেবেন—

হঠাৎ থমকে গেল। তারপরই হেসে খানখান। প্রশ্ন রাখল,—আপনিই বলুন পদ্মিনী চাইলে না বলবে কেউ? বিশেষতঃ এখন যখন সে উর্বশী।

পত্রকার তার কথায় সায় দিয়ে আমার চোখে চোখ রাখল। বুঝলাম না কি বলতে চাইল সে। পদ্মিনী এখন গম্ভীর। ভাবনায় ডুব দিয়েছে যেন নিজেকে গুছিয়ে নিতে। আমি সাবধান হচ্ছি আক্রমণ প্রতিরোধের। সহসা ঘোর কাটিয়ে উঠল। বাম হাতের চেটোয় ডান হাতের মুষ্টি ঠুকে স্বগতোক্তি করল,—ঠিক আছে।

তারপর পত্রকারকে বলল,—ছেপে দেবেন, উর্বশী পদ্মিনীর পরবর্তী চলচিত্রের কাহিনীকার—

বক্তব্য শেষ না করে তর্জনী দিয়ে সোজা আমার বুকে খোঁচা। তারপর আদেশের শেষ অংশ জুড়ে দিল,—বি সিরিয়াস। আমি যা বলি তাই করি।

পদ্মিনীর কি নেশা ধরেছে? মনে ত হয় না, কারণ এ রসে সে ভালই রপ্ত, নতুবা সাতসকালে প্রাতঃরাশের পর শুরু হয় কখনও। তাহলে কি রসিকতা, একটু রঙ্গরস? অথবা কল্‌কে না পাওয়া

এই লেখককে নাচিয়ে মজা করা, যেমন পোষা কুকুরের কসরৎ উপভোগ করার জন্য আকাশের দিকে বিস্কুট ছুঁড়ে দেওয়া। আমি ঘামছি ; ভয়ে লজ্জায়। এখন অনুশোচনা হচ্ছে এদের সঙ্গ ধরার জন্য। আস্ত গাধা বনে যাচ্ছি।

সারমেয় দুটি এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। এবার দর্শন দিল। এদের বোধহয় স্থান নির্বাচন নির্দিষ্ট। লাসা এপ্‌সো প্রথম লাফে সোফার হাতলে, দ্বিতীয় চেষ্টায় মালিকানের হাতের মুঠোয়। ওকে অনুসরণ করে এখন নজরে পড়ল পদ্মিনী শাড়ী বদল করেছে। ঘোর লাল রংএর বেনারসীর পাড়ে সোনার সূক্ষ্ম কাজ। ঠিক যেন যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি দেওয়ার পরে হুতাশনের লেলিহান শিখা।

মেঘশিশুর সাহচর্যে উর্বশীর উগ্রতা স্তিমিত হল। শান্ত গলায় বলল,—যে ছবির জন্য আমি 'উর্বশী' পুরস্কার পেলাম তার গল্পকার কত পেয়েছিল জানেন ?

বললাম,—জানি না। শুনেছি গল্পের চিত্রসত্ত্বের দাম অনেক।

আমার কথার জবাব নয়, নিজের কথার জের টানল,—পঞ্চাশ হাজার। আপনি পাবেন পুরো এক লাখ।

শুনে আমার চোখ পিটপিট, বিড়ালের সামনে মাছভাজা। ভোজবাজির মত নিজের সংসারের ছবিটা ফুটে উঠল। কালিঝুলি পড়া ঘুপচি রান্নাঘর, টালির ছাদঢাকা প্রাতঃকৃত্যস্থান, শ্যাওলাপড়া কলতলা, বুড়ো মানুষের লোল চামড়ার মত মেঝের দুখানা ঘর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত।

শেষ হল না ছবিটা। বিরতির ঘণ্টা বাজাতেই হল ভদ্রতার খাতিরে। বললাম—ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আপনার কথা চিরকাল মনে থাকবে।

বিদায় দেওয়া নেওয়ার রীতি প্রয়োগ করেও রেহাই পেলাম না। স্মিত হাসিতে অধরোষ্ঠ বাঁকা করে বলল,—দাঁড়ান। আমার কথা ত

শেষ হয়নি। গল্পের প্লট আমিই দোব। বলে রাখি, নায়িকা হবে বাচ্চু ওরফে প্রতিভা সিংহ। স্বভাবতই আপনাকে কয়েকটা সিটিং দিতে হবে আমার সঙ্গে, নইলে গল্পটা নিছক কল্প-কথা হয়ে যাবে।

মনে মনে উচ্চারণ করলাম,—হে দেবী!

পরক্ষণেই মনে হল উর্বশী কি দেবী পর্যায়ে পড়বে। কোথাও ত এমন সম্বোধন আছে বলে মনে পড়ছে না। সকল ক্ষেত্রেই তার সম্বোধন,—সুন্দরী! অপ্সরে!

এই সম্বোধনটি এখন যদি উচ্চারণ করি তাহলে অবশ্যই চপেটাঘাত। মনে পড়ল মা আমাকে কিছু স্থাবর সম্পত্তি দিয়েছিল। সেই দানপত্রে লেখা ছিল দাতা শ্রীমতী মহামায়া দেব্যা।

অকূলে কূল মিলল। অতএব দেবযোনী উর্বশী অবশ্যই দেবী।

বাকী ভাষণটুকু সাজিয়ে নিলাম,—দেবী! আপনাদের কর্মব্যস্ততার সুযোগে উর্বশী কাহিনীর খসড়া করিয়া ফেলিয়াছি। অনুমতি হইলে ব্যক্ত করিতে পারি। বাচ্চু ওরফে প্রতিভা সিংহকে ঐ কাহিনীর মধ্যে যথাযথ স্থান করাইয়া দেওয়া যাইবে।

চিন্তা করা সহজ, প্রকাশে বহু বাধা। অতএব ছেদ টানার জন্য বললাম,—বেশ ত আপনার যেদিন সময় হবে জানাবেন। আপনার কোলকাতার বাড়ীতে চলে যাবো। ঠিকানা আমি জানি।

ছোট খুকীর মত পদ্মিনীর কলোচ্ছাস,—গুড, ভেরি গুড। আমার ঠিকানাও জানা আছে তাহলে? হ্যাঁ, তবে কাহিনীর শেষটা হবে কিন্তু মেরেলিন মনরোর মত অন্তর্ধান। সে কেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে আত্মঘাতী হল জানেন?

মনে মনে বললাম,—নির্ঘাৎ মাতালের পাল্লায় পড়েছি। ছাড়া পেলে বাঁচি। আওয়াজ দিলাম, না।

মাথা দুলিয়ে জবাব এলো,—আমিও জানি না। তবে আমার নিজস্ব একটা ধারণা আছে। বিত্ত বৈভব যশ খ্যাতি মানুষকে হয়ত পাগল করে দেয়, বিশেষ করে নিঃসঙ্গতার জ্বালা যদি তাকে কুঁরে

কুঁরে খায়। আমি বুঝি সেটা। এই নিঃসঙ্গতার কারণেই তাই মাঝে মাঝে আত্মগোপন করি। যেমন এখন।

দেখলাম পদ্মিনীর চোখের জলে প্রসাধনের প্রলেপ ধুয়ে যাচ্ছে। আমি বাক্‌হীন। সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে সামাল দিলাম। ততক্ষণে একাক্ষীর যন্ত্রের ঝিলিক। সঙ্গে সঙ্গে ধমক,—ষ্টপ ছ্যাট ন্যুইসেন্‌স। রোল খুলে দিন আমাকে।

পদ্মিনীর দুচোখে জল আগুনের খেলা। একাক্ষী ক্ষমা চাইল। পদ্মিনী তবু রুক্ষ, উর্বশী কখন কাঁদে না। এ ছবি যেন ছাপা না হয়। আপনারা সুসংবাদ বহন করে এনেছিলেন, তার বিনিময়ে অনেক সময় সুযোগ দিয়েছি।

আঁচলের প্রান্তে চোখের জল তুলে নিয়ে পদ্মিনী পরমুহূর্তেই হাস্যময়ী। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, জানেন,—অজানা এক জ্বালায় জ্বলে মরি, মদে আর ঘুমের বড়িতেও কাজ হয় না, তখন বিবসনা আমি আরশির সামনে বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খুঁজে মরি কি আছে এই দেহে; যার এখান ওখানের একটু আড়াল ঘুচিয়ে দিলে তার আকর্ষণে পয়সা আসে। নামীদামী লোকগুলো এই একতাল মাংসের মধ্যে কি পায় যার জন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে চায় আমাকে। আমি ত এভাবে কাউকে তুলে দিতে পারলাম না নিজেকে।

আশ্বাস দিলাম,—একদিন নিশ্চয়ই সুযোগ আসবে। অনেকেরই ত তেমনটি ঘটেছে।

পদ্মিনী তখন অন্য জগতে,—আপনার গল্পের শেষে আমি আবার বাচ্চা হতে চাইব, তাকে খুঁজব। পাগলের মত খুঁজব। না পেয়ে, মানুষ যা দর্শনের জন্য পাগলামি করছে, শেষ দৃশ্যে এই দেহটা, নিষ্প্রাণ দেহটা থাকবে সম্পূর্ণ বিবসনা। দুচোখ ভরে মনের সুখে সকলের দিব্যদর্শন হোক অপ্সরা উর্বশীর।

জিভের ডগায় জবাব এসেছিল,—একটু আগেই তুমি না

বলেছিলে নারী শুধু পণ্যা ভোগ্যা। সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনে যে কারণে বা যে ভাবেই হোক অবস্থাটা একসময় সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সত্য। তাই বিংশ শতাব্দীতে বোধদয়ের উজ্জলতম আলোয় শুরু হয়েছে অবস্থা পরিবর্তনের কারণে নারী আন্দোলন, স্ত্রী স্বাধীনতা, পুরুষের সমান অধিকার। অতএব ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, কপাটি খেলা, সাইকেল, স্কুটার, মোটর চালাও, জজিয়তি, ওকালতি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা পেশা বা চাকুরীতে নেমে পড় ; চাই কি পকেটমার রাহাজানি, ডাকাতি ব্যাংকলুঠও করতে পার। স্ত্রী স্বাধীনতার পুরোধাগণের জ্ঞানগর্ভ জ্বালাময়ী ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে কাঁচুলি পোড়াও. উৎসাহে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সব আবরণ ছুঁড়ে ফেলে স্বাক্ষর রাখো এই দেহে অভিনব মায়া কিছু নাই, নাই কোন দুর্বলতার স্থান। কিন্তু বিশ্বের কয়েক শত কোটি নারীর মধ্যে ওরা কতজন ? সিন্ধুতে বিন্দুর মত। বাকি সবাই ? ওদের আরেকটা বড় কেন্দ্রবিন্দু আছে। তারা কারা ? যারা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্র করায়ত্ত্ব করে ছুটোপুটি লাগায় ফ্যাশন প্রসাধনের অজুহাতে নিজেকে রমনীয়, কমনীয়, আকর্ষনীয়, করার ইঁদুর-দৌড়ে। ওদের উদ্দেশ্য একটাই এবং তা সহজবোধ্য। পসরা সাজায়ে এই যে আমি, কে নিবি গো নে। যেন উৎসর্গীত প্রাণ। ওদের আচরণের হাওয়া লাগে আরও কয়েক কোটি নারীর মনে। তারা 'এই ত সভ্যতা' বিবেচনা করে গা ভাসায় সেই স্রোতে। ফলে দেবতার ভোগেও লাগতে পারে, বাঁদরে ছিঁড়েকুটেও খায়। এবার যদি পুরুষ নারীকে পণ্য ভাবে দোষ কি, নারী নিজেই ত পণ্যা হতে চায়। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন নেই কেন, যত বিষোদ্গার স্বল্পবাসা নারীদেহ-সর্বস্বচিত্রের বিরুদ্ধে ; হুমকি শুধু লোকসভা, বিধানসভা আর সভাসমিতিতে ? ঐসব চিত্র আর বিজ্ঞাপন ত শিল্পীর রংতুলির টান নয়, রক্তমাংসের নারীর স্থির বা চলচ্চিত্র। মডেল বা তারকা নামধারী এদের পরিচয় ত গোপন নয়, এই নারীই ত নারীর চরম শত্রু, এরা

নিজেদের পণ্যা সাজিয়ে অন্যজনকে পণ্যা হতে উৎসাহিত করছে। কৈ এদের বিরুদ্ধে ত মেয়েরা আওয়াজ তোলে না। কোনদিন কি কেউ দেখেছে কয়েক শত নারী ঘেরাও করেছে কোন অভব্য-বেশভূষা-সজ্জিতা যুবতীকে? এও নিশ্চয়ই পুরুষের কারসাজি? ভিক্ষা চেয়ে একমুঠো চাল বা দশটা পয়সা পাওয়া যায়, স্বাধীনতা মেলে না। স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। আন্দামানের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বা দণ্ডকারণ্যের গভীর অরণ্যে যে মানুষরা বাস করে, যারা আজকের সভ্যতা নামক মানদণ্ডে বন্য, অসভ্য বর্বর; তাদের কাছে শিখে এস স্ত্রীস্বাধীনতা কাকে বলে। ওরা প্রায় নগ্ন সত্য; তবু সভ্য নারীর মত বেলেল্লাপনা পোষাকে পণ্যা হিসাব গণ্যা নয়। ওরা লড়তে জানে, আত্মরক্ষা করতে পারে। তাই পুরুষের সমমর্যদা ভোগ করে। সেখানে নারী নিয়ে বেসাতি চলে না। পত্রকারের বাচ্চুদি! হে একালের উর্বশী! আমার আশার আলো! অর্থ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি নিজেই কি নিজেকে পণ্যা করে তোলনি? তারই জন্য কি তোমার স্বপ্নের কাহিনীতে তুমি মৃত্যুর দৃশ্যে সম্পূর্ণ বিবসনা হতে চাইছ না?

এক লহমায় এত কথা ঝিলিক দেয়। তবু বলা হয় না কিছুই। এই মুহুর্তে আমিও যে আরেক ধরনের পণ্য হয়ে পড়েছি। চোখের পর্দায় আগামী দিনের লক্ষমুদ্রার লুব্ধ চাকচিক্য আমাকে গ্রাস করেছে।

লক্ষ্মীভাগ্য আমার নয়। দেবী ত নয়ই, দেবযোনির সাক্ষাৎও আর ঘটেনি। তবে সেদিনের সাক্ষাৎকারের সচিত্র প্রতিবেদনে আমার নামের সঙ্গে পদ্মিনীর পরবর্তী ছবির বাসনার উল্লেখ থাকায় প্রথমদিকে বেশ উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। লক্ষ মুদ্রার লোভে কাগজকলমের ঘষাঘষিতে গল্পের একটা খসড়া দাঁড় করিয়েও নিয়েছি,

অন্ততঃ প্রথমদিনের আলোচনায় বসে আমার চিন্তাটা যেন ভাসাভাসা তুলে ধরতে পারি। কিন্তু সব চেষ্টাই অসার, ডাক আসে না।

মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে। আমি তার ব্যতিক্রম নই। উর্বশী-চিন্তা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি; বরং গল্পের কাটা ছেঁড়া করে অপার আনন্দ। যৌবনে খাজুরাহো কোনারক বহুস্থানের মন্দির গাত্রের স্থাপত্য নিদর্শন সংগ্রহের নেশা ছিল। মূল বস্তু নয়, আলোকচিত্র। কোনটা স্বচক্ষে দেখা, কিছু চিত্রপটে। মাথার কালোচুল এখন শরতের কাশবন। উর্বশীর টানে বিগত যৌবনের চিত্রগুচ্ছের ফাঁস খুলতে হল। বেছে বেছে অপ্সরা, বৃক্ষদেবী, যক্ষিণী, সুরসুন্দরীদের আলেখ্যগুলো সাজিয়ে রাখলাম লেখার টেবিলে। ওরা প্রতীকি; উর্বশী-কথার অনুপ্রেরণা। অপরূপ অঙ্গভঙ্গ, দেহসৌষ্ঠব; কিন্তু ভাব একটি—লাস্য। সকলেরই এক উদ্দেশ্য নিজেকে প্রকাশ করে মনোহরণ।

ওদের দেখতে দেখতে ওদের নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমারও একদিন বিভ্রম ঘটল। বললাম,—তোমরা শুধুই কেন ভোগ্যা, পণ্যা?

বাতাসে ওরা দুলে উঠল। আমার মনেহল ওরা যেন সজীব হয়ে বলল,—শিল্পী আমাদের দেহটুকুই শুধু দেখেছে, প্রাণের স্পর্শ ত নেয়নি। কেমন করে বলব মনের কথা।

চমক ভেঙ্গে দেখি বাতাসে ওরা উল্টে গিয়েছে। মতিভ্রম; বার্ধক্যে উর্বশীকে নিয়ে মতিভ্রম নিশ্চয়ই।

মাসকয়েক পরে হঠাৎ একদিন দেখা সেই পত্রকারের সঙ্গে। সে বলল,—বাচ্চুদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার হালের ছবির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। তোমার কথা হল। পুরোণ চুক্তির ছবিগুলো শেষ হলেই ডাকবে তোমাকে। মনেহল ফাইনান্সার মোটামুটি ঠিক, পরিচালনা বোধহয় নিজেই করবে।

অন্ধকারে একটু আলোর ইশারা। কিন্তু আগেই বলেছি ভাগ্যে সকলের সব হয় না। এই ঘটনার কয়েক মাসের মাথায় কোন এক ছবির আউটডোর সুটিং শেষে ফেরার পথে পদ্মিনীর গাড়ী দুর্ঘটনা। হাসপাতালে যমে মানুষে লড়াই করে আরও দু'মাস পরে এযুগের উর্বশী ঘরে ফিরল।

লোভ ছিল মনে, একদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা

হয়নি, শুনে এলাম বাড়ীর মালিকানা বদল হয়ে গিয়েছে। পদ্মিনীর ঠিকানা ওর. দিতে পারল না।

কেমন একটা দুঃখবোধ জাগলো। সেই পত্রকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। পদ্মিনীর কথা বলতে প্রথমটা যেন ঠাওর করতে পারল না। শেষে মালুম হতে বলল,—ও ছাট স্নব এ্যাক্‌ট্রেস। বোধহয় মরে গিয়েছে। তুমি কি এখনও লাখটাকার স্বপ্নের ঘোরে আছ?

না।

তারপর কিছুকাল কেটে গিয়েছে। প্রসঙ্গটা ভুলে গিয়েছি। উর্বশী ফাইল-বন্দী। সাহিত্যে তখন ছিটেফোঁটা নাম হয়েছে। একটা অনুষ্ঠানে বর্ধমানে গিয়ে কলেজের পুরোন বন্ধুর অতিথি হয়েছিলাম। শহর দেখতে বেড়িয়েছিলাম বন্ধুপত্নীর সঙ্গে। বন্ধুর কাজে কামাই করার উপায় নাই, ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজ। অতএব আমরা দুজনে এক রিক্সায়। শের আফগানের সমাধি দেখতে যাচ্ছি; একদা সুন্দরী পত্নীর জন্য যাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। পথে যান অচল। চেন পড়ে গিয়েছে। হঠাৎ বন্ধুপত্নী বললেন,—পদ্মিনীর নাম শুনেছেন? ক'বছর আগেও যে ছিল পর্দার রাণী?

হৃদপিণ্ডটা লাফ দিল জোরে। সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বললাম,—নাম শুনেছি।

পাশের বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বন্ধুপত্নী বললেন,—সে এখন এই বাড়ীতে থাকে।

আপনার সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

না-আ-আঃ! আগের দিন হলে আলাপ করার চেষ্টা করতাম।

দেখেছেন তাকে হালফিল?

না। শুনেছি দুর্ঘটনায় নাকি চেহারা কুৎসিত হয়ে গিয়েছে। একটা সর্বক্ষণের ঝি আছে। সেই ঘরে বাইরের সব কাজ করে। বলতে পারেন নির্বাসন-জীবন।

পদ্মিনী প্রসঙ্গে বন্ধুপত্নীর বেশ তাচ্ছিল্য। অথচ তার অভিনীত ছবির আলোচনা তুলে দেখলাম উচ্ছ্বসিতা।

কাউকে জানতে দিইনি। পরদিন সকালে সেই বাড়ীর দরজায় কড়া নেড়েছিলাম। বেশ কয়েকবার। ভিতর হতে দরজা খুলতে খুলতে কৈফিয়ৎ তলব,—এত দেরি করলি নিয়তি।

খোলা দরজার এপাশ ওপাশে দুজনেরই বিস্ময়। ঘোর কাটতে প্রশ্ন হল রুক্ষ গলায়,—কাকে চাই ?

ঘাড় পর্যন্ত নতুন গজানো চুলে কেরামতি করে মাথার বামপাশের মসৃণ অংশ ঢাকার প্রয়াস, বামগালের পোড়া অংশের পরিসর গলা বেয়ে কাঁধ পেরিয়ে জামার ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। নাকটা থ্যাতলানো। বামহাতের সবটুকুই পোড়া। বয়সের আসল মাপ ছাপ ফেলেছে অস্তগমনের প্রসাধনহীন মুখে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। তবু চিনতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। নাম জানিয়ে বললাম,—আমি আপনার মানে পদ্মিনী দেবীর কাছে এসেছি।

মহিলা মেজাজের উপর জবাব দিল,—ও নামে এখানে কেউ থাকে না।

বলেই দরজার পাল্লায় টান। আমি শেষ চেষ্টা করলাম,—বাচ্চুদি।

মরে গিয়েছে।

মুখের উপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পথে নামলাম। আনমনা হাঁটছি। আরেকটু হলেই সাইকেল চাপা পড়তে হত। আরোহীর খিস্তিতে জ্ঞানোদয় হল। চোখ মেলে দেখলাম স্ট্যাণ্ডের উপর উপর একডাঁই কাগজ, সিনেমা সাপ্তাহিক। রঙীন লাস্যময়ী ছবি, সাত কলম জুড়ে হেডলাইন—এ বছরের উর্বশী সুরঞ্জনা পাল।

সব স্বপ্নের অবসান। ভাঙ্গা মন নিয়ে ফিরছি। পথে এক পাঠাগার প্রাঙ্গণে কিশোর কিশোরীদের সমাবেশে গুটিকয় বয়স্ক ব্যক্তির খবরদারী। সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু বেদীর উপর একালের জ্ঞানতপস্বী কবিগুরুর মর্মরমূর্তি শ্বেতকরবীর মালায় সজ্জিত। মাইকে একটি কিশোর কণ্ঠে উদ্গীত, উর্বশী।

থমকে দাঁড়ালাম। সহসা সত্য উপলব্ধি হল। উর্বশী একটা ধ্যান মাত্র ; যৌবনের অনির্বাণ বহ্নিশিখা। কোন অনুভূতি ত কন্যা বধূ মাতার ভূমিকা নিতে পারে না। সবটুকুই পুরাণকারের সাজানো কথা। উর্বশী হৃদয়নন্দনবাসিনী, আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ঊষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা, আবির্ভাব মাত্র পূর্ণপ্রস্ফুটিতা, অবন্ধনা, অকুণ্ঠিতা, অনিন্দিতা, বধিরা, নিষ্ঠুরা। মহাকাশের ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জের মত আমার তোমার মনের আকাশে উর্বশী সদা প্রবহমানা, চিরযৌবনা।

———